মাধ্যমিক

বাংলা সহপাঠ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর সহপাঠরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ

নবম-দশম শ্রেণী

উপন্যাস
হাজার বছর ধরে - জহির রায়হান

নাটক
কবর - মুনীর চৌধুরী

সংকলন ও ভূমিকা
মুঃ আবদুল হালিম চৌধুরী
শিক্ষক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, রাজশাহী

সম্পাদনা
ড. সফিউদ্দিন আহমদ
প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ
সিলেট মুরারি চাঁদ সরকারি কলেজ, সিলেট।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাবিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। এছাড়া ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এ ভাষাকে কেন্দ্র করে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা-দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন বিশ্বপরিসরে ব্যাপ্ত। সুতরাং এখন এ ভাষার ব্যবহারিক দিকে ব্যুৎপত্তি অর্জন যেমন প্রয়োজন তেমনি সৃষ্টিশীলতায় দক্ষতা ও কুশলতা অর্জনও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাকে হতে হবে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। আমরা আশা করি, নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ'-এ বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে কিছু বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'সাহিত্য' শব্দটির সঙ্গে 'সহিত' শব্দটি সম্পর্কযুক্ত। অন্যত্র তিনি 'সাহিত্য' শব্দটিকে 'সম্মিলন' অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ সম্মিলন মানেই হচ্ছে মনে মনে, আত্মায় আত্মায় ও হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন। সাহিত্য শব্দটির সাথে হিত, কল্যাণ, মঙ্গলও সম্পর্কযুক্ত।

মানুষের আছে সমাজ ও ধর্ম। আছে তার অর্থনীতি ও রাজনীতি। এ ছাড়াও রয়েছে তার ভালোবাসা, দুঃখ ও আনন্দ, বেদনা ও অভাব-অনটন, হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতি ও বিচিত্র ধরনের চাওয়া-পাওয়া। এ সব নিয়েই সাহিত্য। এ সব নিয়েই উপন্যাস ও নাটক।

সাহিত্যের একটি ধারা হচ্ছে সাময়িক বা প্রয়োজনীয় সাহিত্য, অপর ধারাটি হচ্ছে চিরায়ত বা চিরন্তন সাহিত্য। সাময়িক বা প্রয়োজনীয় সাহিত্যের আবেদন প্রয়োজন মিটলেই ফুরিয়ে যায়। চিরায়ত বা চিরন্তন আবেদনের সাহিত্য যুগোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ, মনোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ। Keats এ সাহিত্যকেই বলেছেন- A thing of beauty is joy for ever এবং Beauty is truth and truth is beauty.

সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্ব রয়েছে। এরিস্টটল বলেছেন- Art is the imitation of life. ম্যাথু আরনল্ড বলেছেন- Literature is the criticism of life.

সাহিত্যিকদের মধ্যে একদল আছেন কল্পনাবিলাসী, স্বপ্নবিলাসী ও সৌন্দর্যচারী। তাঁদের কাছে নান্দনিক ও শিল্পসৌন্দর্যের দিকটাই বড়। অপরদল বলে থাকেন, শুধু সৌন্দর্য সাধন নয়, উদ্দেশ্য সাধনও শিল্পকলার একটি বড় দিক। সমাজ সচেতনতা, মেহনতি মানুষের সংগ্রাম ও বিদ্রোহ এবং অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে সাহিত্য। এঁরা বাস্তববাদী। মহান শিল্পী গোর্কি বলেছেন- 'মেহনতই সমস্ত শিল্পকলার উৎস'।

মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলা সহপাঠে দুটি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এর একটি জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস, অপরটি মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক।

জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে রয়েছে চিরায়ত ও আবহমান বাংলার জীবনপ্রবাহের বাণী-বিন্যাস। ছবির পর ছবি, চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে তিনি আবহমান বাংলার গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনাকে নান্দনিক ঐশ্বর্যে তুলে ধরেছেন। শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে রয়েছে মহান ভাষা আন্দোলন, বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উজ্জ্বল উচ্চারণ আর গণসচেতনতা এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের উষ্ণ আবেগ এবং দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ত্যাগের আবহ।

'উপন্যাস' ও 'নাটক' সাহিত্যের দুটি ভিন্ন আঙ্গিক। এ দুটি আঙ্গিকের সঙ্গে মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের যেমন পরিচয় হওয়া দরকার তেমনি বাংলা উপন্যাস ও নাটক সম্পর্কে তাদের যৎকিঞ্চিত ধারণা থাকাও প্রয়োজন। তাই উপন্যাস ও নাটকের সংজ্ঞা, আঙ্গিক ও গঠনকৌশল, শ্রেণীবিভাগ, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার পরিচিতি, উপন্যাস ও নাটক পরিচিতি, উপন্যাস ও নাটকের চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. উপন্যাস

ক. উপন্যাসের সংজ্ঞা

সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা উপন্যাস। বৈশিষ্ট্যানুসারে এর সংজ্ঞা হলো– গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে। অর্থাৎ উপন্যাসে লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো কাল্পনিক বা বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়। সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি এতে প্রতিফলিত হয় বলে এর পটভূমি হয় বিস্তৃত। ব্যাপক আকৃতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা-বিন্যাস, আকর্ষণীয় গল্পরস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি, সাবলীল সংলাপ ও মনোমুগ্ধকর বর্ণনাভঙ্গি সার্থক উপন্যাসে একান্তভাবে কাম্য।

খ. উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় বলেছেন–"ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।" এই আবেগকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনুভূতি রং-রেখা-শব্দ বা রূপকের সাহায্যে লেখক বা সাহিত্যিক অন্যের নিকট প্রকাশ করে থাকেন। যিনি প্রকাশ করেন তিনি সাহিত্যিক আর যা প্রকাশ করেন তাই সাহিত্যের বস্তু বা সামগ্রী।

জগৎ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি সাহিত্যে বাণীরূপ পায়। প্রতিফলিত হয় দেশ, কাল ও সমাজের বাস্তবরূপ। সাহিত্যের পাঠক সাহিত্য থেকে রসমাধুর্য উপভোগ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন ও চারপাশের পরিচিত জগতের রূপটিও নতুন করে দেখার সুযোগ পায়। রচিত সাহিত্য যদি সাহিত্যিকের হাতে রসমধুর রূপ লাভ করে, তাহলে পাঠকের নিকট তা হয়ে ওঠে সীমাহীন আনন্দের সামগ্রী। সর্বকালের সহৃদয় জনের হৃদয়বেদ্য ভাবকে আত্মগত করে তাকে পরের করে প্রকাশ করাই সাহিত্য। এ জন্য সাহিত্য একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়েও ব্যক্তি-নির্বিশেষ। এ ব্যক্তি-নির্বিশেষ সাহিত্য মানব মনের আনন্দ পিপাসা মেটানোর জন্য যুগ যুগ ধরে সমাদৃত।

বাংলা সাহিত্যের পথযাত্রা শুরু প্রায় হাজার বছরেরও পূর্বে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ'। তখন থেকে বাংলা সাহিত্য হাঁটি হাঁটি পা পা করে মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য, জীবন চরিত; কল্পনা-নির্ভর প্রণয়োপাখ্যান পুঁথি সাহিত্য ইত্যাদি কাব্য সম্ভারের স্তূপ পাড়ি দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি। উপন্যাসের অবয়ব গঠিত হয় আখ্যানভাগ, চরিত্র-চিত্রণ, পরিবেশ কল্পনা ও বাণীভঙ্গির যথাযথ মেলবন্ধনে। উপন্যাসে থাকে একটি দীর্ঘ গল্প। এ গল্পটি যখন কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরিবেশিত হয়, তখন তাকে আখ্যানভাগ বলে। আখ্যানভাগকে মূর্ত করে তোলে চরিত্র। তবে আখ্যান বা ঘটনা ও চরিত্র পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। চরিত্র মাকড়সার মতো নিজের চারদিকে ঘটনার জাল বুনে ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টি করে এবং ঘটনার চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সুতরাং চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসের মাধ্যমে জীবনপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। উপন্যাসে পাত্রপাত্রীদের কথোপকথন অত্যাবশ্যক। আর সহজ সরল ও স্বাভাবিক কথোপকথন উপন্যাসের চরিত্র বিকাশে বিশেষ সহায়ক। তদুপরি দেশ, কাল, সমাজ এবং সমাজের রুচি, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি অনুযায়ী যথাযোগ্য পটভূমি নির্বাচন করতে হয়। মোট কথা, উপন্যাসের প্রধান দাবি তার বাস্তবতা এবং চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে তা পরিব্যাপ্ত করা। ভাষা বা বাণীভঙ্গিকে বলা হয় উপন্যাসের চিৎশক্তি। কারণ একমাত্র সহজ ও সাবলীল ভাষার গুণে গ্রন্থকার পাঠকের কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

গ. উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

ইংরেজি ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সৃষ্টি। উপন্যাসকে সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১. ঐতিহাসিক উপন্যাস
২. সামাজিক উপন্যাস

৩. কাব্যধর্মী উপন্যাস

৪. ডিটেকটিভ উপন্যাস

১. ঐতিহাসিক উপন্যাস

কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে যে উপন্যাস রচিত হয় তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনাকে বিকৃত না করে শিল্প সৌকর্যের মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা। এ ধরনের উপন্যাসে কল্পনার রং অবশ্যই থাকবে। কারণ ঔপন্যাসিক ইতিহাস নয়, উপন্যাস রচনা করবেন। ইতিহাসের মাল-মশলা, উপকরণ ও তথ্য নিয়ে তিনি কঙ্কালের ওপর রক্ত মাংস দিয়ে একে আরো সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলবেন। এ ধরনের উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' ও 'রাজসিংহ', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' ও 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট', প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুনশী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদ সঞ্চার', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' ও শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃত জন' উল্লেখযোগ্য।

২. সামাজিক উপন্যাস

সমাজের বাস্তব ঘটনা ও কাহিনী নিয়ে যে উপন্যাস রচিত হয় তাকে সামাজিক উপন্যাস বলে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ'; শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', 'পল্লী সমাজ', 'দেনা পাওনা', 'দত্তা'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন'; কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতি', 'দৃষ্টি প্রদীপ'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য'; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু' ইত্যাদি।

৩. কাব্যধর্মী উপন্যাস

যে উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের স্নিগ্ধ কবিকল্পনা ও রসমাধুর্য প্রাধান্য পায় তাই কাব্যধর্মী উপন্যাস। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল কুন্ডলা', রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শবনম'।

৪. ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা উপন্যাস

খুন, হত্যা, রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনীকে নিয়ে যে উপন্যাস রচিত হয় তাই ডিটেকটিভ উপন্যাস। যেমন বনফুলের 'পাণ্ডব পর্ব'।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী নিয়েও অনেক আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য রহস্যকাহিনী লেখা হচ্ছে। এগুলোকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীমূলক উপন্যাস বা Science Fiction বলে। তাছাড়া, মানবজীবনের জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি নিয়ে নানা আঙ্গিক ও নব নব উপস্থাপনায় ও বিন্যাসে উপন্যাস রচিত হচ্ছে।

সুতরাং উপরিবর্ণিত উপন্যাসের চারটি বিভাগ বা শ্রেণীকরণ ছাড়াও উপন্যাসের অনেক শাখা ও উপশাখা রয়েছে। তাছাড়া একই উপন্যাসে নানা রকমের আঙ্গিকের মিশ্রণও ঘটতে পারে।

ঘ. বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলা উপন্যাসের বীজ মধ্যযুগের রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যানের মধ্যে তথা আলাওল, দৌলত কাজীর কাব্যে এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে' উপ্ত হলেও গদ্যরীতি প্রচলনের পরই আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। মূলত ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় আধুনিক বাংলা গদ্যচর্চা।

বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজের ব্যঙ্গারসাত্মক চিত্র, লোকরঞ্জক নক্‌শা ও ঐতিহাসিক কাহিনী বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আর এ সবের মূলে ছিল ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে পরিবর্তিত সামাজিক রূপ। তবে প্রকৃত সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবে সার্থক উপন্যাস রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এবং তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির জীবন ও ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সাহিত্যিক গদ্যরীতিতে বাংলা উপন্যাসের পথরেখা নির্মাণ ও নির্ধারণ করেন। তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'আনন্দ মঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সব উপন্যাস ইতিহাস ও সমাজ চেতনার মূর্ত স্বাক্ষর। বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত পথরেখাকে সমৃদ্ধশালী করার ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাস রচনায়ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচিত 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'গোরা' (১৯০৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪), যোগাযোগ'(১৯২৯) প্রভৃতি বাংলা উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের উওরসূরি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায় (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা উপন্যাসের ধারাটিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে যেমন বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, স্নেহ-ভালোবাসার চিত্র সহজ-সরল ও অনাবিল ভাষায় নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন তেমনি সমাজের আচার আচরণ বিশেষত হিন্দু সমাজের নানাবিধ সংস্কারের রূপও উন্মোচিত করেছেন সমান দক্ষতায়। তাঁর রচিত 'শ্রীকান্ত', 'মেজদিদি' (১৯০৫), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'পথের দাবী' (১৯২৬) ও 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

বাংলা উপন্যাসের পরবর্তী ধারাটি বিষয় বৈচিত্র্যে, বর্ণনার বৈশিষ্ট্যে ও অভিনবত্বে কিছুটা ভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। অতি আধুনিক কালের উপন্যাসে সমকালীন চিন্তাধারা ও সমস্যার ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষযোগ্য। এ সময়ের উপন্যাসে বিশেষভাবে বিষয় ও আঙ্গিকের ভাঙাগড়ার ছাপ স্পষ্ট। এ সময়ের কয়েকজন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক হলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), বনফুল (১৮৯৬-১৯৭৯), বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১) ও সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৭৪-১৯১২), মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), মাহবুবুল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৯), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫-১৯৭৪) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঙ. বাংলাদেশের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বতন্ত্র পরিবেশে উপন্যাস সাহিত্য ধারার যে বিকাশ তাতে এখানকার গ্রামীণ জীবন, নাগরিক জীবন, আঞ্চলিক জীবন, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস চেতনা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্যে ব্যাপক হলেও গুণগত উৎকর্ষ বিচারে বাংলাদেশের উপন্যাস এখনও তেমন সমৃদ্ধির শীর্ষ সীমায় পৌঁছেনি। এ সব ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের মধ্যে আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) 'চৌচির', 'প্রদীপ ও পতঙ্গ', রাঙ্গা প্রভাত'; আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯), 'সত্যমিথ্যা', 'জীবন ক্ষুধা', 'আবে হায়াত'; শওকত ওসমানের (১৯১৯-১৯৯৮), 'জননী', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'জাহান্নাম হতে বিদায়', 'বনি আদম', 'বেড়ী'; সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) 'লাল সালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো'; আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) 'সূর্যদীঘল বাড়ী', 'পলি মাটি পলি দ্বীপ'; আকবর হোসেনের (১৯১৭-১৯৮১) 'অবাঞ্ছিত মোহমুক্তি'; রশীদ করিমের (১৯২৫) 'উত্তম পুরুষ', 'প্রসন্ন পাষাণ', 'আমার যত গ্লানি'; শহীদুল্লাহ কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) 'সারেং বউ', 'সংশপ্তক'; আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২) 'কর্ণফুলী', 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', 'ক্ষুধা ও আশা'; জহির রায়হানের (১৯৩৩-১৯৭২) 'শেষ বিকেলের মেয়ে', 'আরেক ফাল্গুন', 'বরফ গলা নদী', 'হাজার বছর ধরে', 'তৃষ্ণা'; সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫) 'অনুপম দিন', 'এক মহিলার ছবি'; আবু রুশদের (১৯১৯) 'সামনে নতুন দিন', 'ডোবা হলো দিঘি', 'নোঙর'; শওকত আলীর (১৯৩৬) 'পিঙ্গল আকাশ', 'যাত্রা', 'কুলায়ে কালস্রোত', 'পূর্ব দিন পূর্ব রাত্রি', 'প্রদোষে প্রাকৃত জন' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দৌলতুন্নেসার (১৯১৮) 'পথের পরশ', 'বধূর লাগিয়া'; নীলিমা ইব্রাহীমের (১৯২১-২০০০) 'পথ শ্রান্ত', 'বিশ শতকের মেয়ে', 'এক পথ দুই বাঁক'; রাজিয়া খানের (১৯৩৬) 'অনন্ত অন্বেষা', 'মধুমতী', 'সাহেব বাজার'; মকবুলা মঞ্জুরের (১৯৩৮) 'আর এক জীবন', 'জল রং ছবি', 'অবসন্ন গান'; দিলারা হাশেমের 'ঘর মন জানালা', 'আমলকীর মৌ' 'একদা' এবং 'অনন্ত'; সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭) 'উত্তর সারথি', 'জলোচ্ছ্বাস', 'পদশব্দ', 'হাঙর নদী গ্রেনেড' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অতি সাম্প্রতিক কালে হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮) ও ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫) ঔপন্যাসিক হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

চ. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উপন্যাস পরিচিতি : হাজার বছর ধরে

ষাটের দশকে যখন আমাদের কোনো কোনো ঔপন্যাসিক কখনো ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করে, আবার কখনোবা জাগতিক মোহের কাছে নতি স্বীকার করে এড়িয়ে যান সমাজসত্য আর যুগ-সংক্ষোভ, তখন সমাজ-সতর্ক আর রাজনীতি-সচেতন জহির রায়হান পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করে হয়ে ওঠেন একজন দায়িত্ববান নির্ভীক শিল্পী। তাঁর 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে হাজার বছরের সীমানায় প্রসারিত আবর্তন-সংকুল অথচ বিবর্তনহীন আবহমান পূর্ববাংলার তথা বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন। হাজার বছর ধরে আমাদের পল্লীবাংলার যে আঞ্চলিক জীবনধারা উপেক্ষিত, সেই জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারের সংঘাতময় জীবনের ছবি লেখক অঙ্কন করেছেন তাঁর 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে।

ঔপন্যাসিক : জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)

ঔপন্যাসিক, গল্পকার, খ্যাতিমান লেখক ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের চারপাশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার চিত্র তাঁর রচনাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি তা বাঙালি সমাজের নানা বৈষম্য ও অসঙ্গতির সার্থক প্রতিনিধিও বটে। তাঁর রচিত 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০), 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪), 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯),'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

ছ. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সমাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে চিত্রিত কাহিনী একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের ইতিবৃত্ত। এ ইতিবৃত্ত প্রতিনিধিত্ব করে আবহমান পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজজীবনের। একান্নবর্তী এ পরিবারের প্রধান কর্তা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মকবুল বুড়ো। এ বাড়িতে মোট আট জন লোকের বাস। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবন তাদের। তাই স্ত্রী- পুরুষ সবাইকে জীবিকার তাগিদে ঘরে বাইরে সর্বত্রই কাজ করতে হয়। পুরুষরা ফসলের সময় মাঠে আর মেয়েরা বাড়িতে ব্যস্ত থাকে। তাতেও তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। তাই তারা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়ে জীবিকার চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়। পুরুষরা যায় বাইরে মজুরি বেচতে, নৌকার মাঝি হিসেবে কাজ করতে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জনে, আর মেয়েরা পাতা দিয়ে চাটাই বোনে, অন্যের বাড়িতে রাত জেগে ধান ভানে, বিলে-ঝিলে শাপলা তুলে হাটে বিক্রি করে। তবুও তাদের জীবন সমস্যার সুষ্ঠু কোনো সুরাহা হয় না। সারাজীবন ধরে চলে তাদের এ জীবনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে কখনো তারা বিজয়ী আবার কখনোবা পরাজিত। তাদের এ দুঃখ-দুর্দশার মূলে বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশ, অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টি। তদুপরি আর্থিক কৃচ্ছ্রতার দরুন তারা লাঙল টানার গরু পর্যন্ত কিনতে পারে না। তাই কোদালে কুপিয়ে জমি তৈরি করে, কিংবা অবচেতন মনে চিন্তা করে গরুর বদলে ঘরের বউকে দিয়ে রাতের বেলা সবার অগোচরে লাঙল টানাবার। অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে কুসংস্কারেরও কোনো ঘাটতি নেই। তারা বিশ্বাস করে কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা রোগ ইত্যাদি দেব-দেবীর কুদৃষ্টির ফল। জ্বীন-ভূতের বিশ্বাসও তাদের মধ্যে প্রবল। গ্রাম্য কোন্দল, পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ থেকেও তারা বিরত নয়। যেখানে নারী-সত্তার কোনো মূল্য নেই এবং প্রেম ও ভালোবাসার কোনো গুরুত্ব নেই, নারী সমাজ

সেখানে নিগৃহীত, নির্যাতীত এক ভারবাহী জীব-সদৃশ, সেখানে তাদের প্রতিবাদ করার কোনো পথ নেই। আর ভুলেও যদি কেউ তা করে, তাহলে তার ভাগ্যে জোটে সীমাহীন নির্যাতন। এমন কি হতে হয় ঘর-ছাড়া, সংসার-ছাড়া। এ সব চিত্র আবহমান বাংলার। আজও এর প্রতিফলন আমরা বাংলার পল্লী অঞ্চলে দেখতে পাই। এ সব চিত্র ঔপন্যাসিক জহির রায়হান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিপুণ শিল্পীর হৃদয়-কল্পরসে জারিত করে আমাদের সামনে অনবদ্য ভাষাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

জ. উপন্যাসের চরিত্র পরিচিতি ও সার্থকতা

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে মকবুল বুড়ো, গনু মোল্লা, ফকিরের মা, মন্তু ও টুনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চরিত্রগুলোর মধ্যমণি মন্তু এবং টুনি। উপন্যাসে প্রভাবশালী চরিত্ররূপে বিকাশ লাভ করেছে মকবুল বুড়ো। মকবুল বুড়োর সর্বগ্রাসী প্রভাবে মন্তু চরিত্র তেমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে পারেনি। মন্তু সাদামাটা এক গ্রাম্য যুবকের প্রতিচ্ছবি মাত্র। যদিও তার চরিত্র বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে সুষ্ঠু বিকাশের অভাবে। গনু মোল্লা গ্রামের একজন সাধারণ ধার্মিক মানুষের চরিত্র।

নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে টুনি, আম্বিয়া, ফকিরের মা, ফাতেমা, আমেনা, সালেহা ইত্যাদি প্রধান। টুনি ও আম্বিয়া ষোড়শী। টুনি বুড়ো মকবুলের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। আম্বিয়া অবিবাহিত। ফাতেমা ও আমেনা প্রতিবাদহীন সহনশীল গ্রাম্য নারীর প্রতিচ্ছায়া। টুনি কিশোরী-সুলভ চপলতার প্রতীক। তার জীবনে সাধ, আহলাদ ও চাপল্যের পরিচয় প্রকট।

তার হৃদয়ে চঞ্চল ভালোবাসার আবেগ রয়েছে। আবেগের টানে সে ঘর ছাড়তে প্রস্তুত। কিন্তু সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বন্ধন তার পায়ে। তবু সে স্বপ্ন দেখে মন্তুকে নিয়ে ঘর বাঁধার। পরিশেষে তা সার্থক না হলেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে টুনি চরিত্রের যে ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটেছে তাতে সে একটি সার্থক চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

আম্বিয়া এক অপ্রতিরোধ্য নারীর প্রতিকৃতি। সে সমাজ সংসারের কোনো প্রতিকূলতাকেই ভয় পায় না। সে জীবনকে গড়ে নিতে চায় নিজের মনের মতো করে। তাই পিতা ও ভাইয়ের মৃত্যুর পর একাকী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের ভয়ে মনের ইচ্ছা ত্যাগ করেনি। সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সে অস্বীকার করে মন্তুকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। চরিত্রটি অতি বাস্তব এবং প্রতিবাদমুখর। অন্যান্য যেসব পুরুষ ও নারী চরিত্র আছে তা অতি সাদামাটা। তারা যেমন কাহিনীর প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে তেমনি কাহিনীর শেষে এসব চরিত্র দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটিতে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই চিত্র আমাদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এ চিত্র আমাদের আবহমান গ্রামীণ জীবনধারারই চিত্র।

২. নাটক

ক. নাটকের সংজ্ঞা

একজন সাহিত্য সমালোচক নাটকের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে– 'জীবন সম্বন্ধীয় ধারণার কাব্যিক প্রকাশ যা অভিনেতারা রূপ দিতে পারে এবং শব্দমাধুর্য শোনার জন্য ও আঙ্গিক ক্রিয়াদি দেখার জন্য উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দান করতে পারে এমন শিল্প মাধ্যম।'

সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে– 'যা দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলে– তাই নাটক।' অন্য কথায় বলা যায়– 'জীবন বিষয়ে ধারণার এমন এক বাহ্যিক প্রকাশ যা অভিনেতাগণ রূপ দিতে পারেন এবং যার শব্দমাধুর্য শুনে ও আঙ্গিক ক্রিয়াদি দেখে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ আনন্দ লাভ করতে পারেন– তাকে নাটক বলে।'

খ. নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

নাটকের ইতিহাস বহু প্রাচীন। গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টির বহু পূর্বে প্রাচীন গ্রিসে নাটক রচনার সূত্রপাত। গ্রিক নাটকের বৈশিষ্ট্যানুসারেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাটক রচিত হয়েছে। ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসও খুব অল্প দিনের নয়। নাটক যেহেতু চোখের সামনে অভিনীত হয় তাই মঞ্চাভিনয়ের উপযোগিতা নাটকের একটি বিশেষ দিক। অর্থাৎ এমনভাবে নাটক রচিত হতে হবে, যাতে করে তা মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

নাটক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, মঞ্চের সীমাবদ্ধ পরিসরে এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি চরিত্রের সাহায্যে অভিনীত হয়। আর সে কারণেই নাটকের স্থান, কাল, ঘটনা ও চরিত্রের সংহতি বা ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। নাট্য সমালোচকদের মতে নাটকের তিনটি ঐক্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেগুলো হল–

(১) সময়ের ঐক্য (Unity of time)

(২) স্থানের ঐক্য (Unity of place)

(৩) ঘটনার ঐক্য (Unity of action)

সময়ের ঐক্য বলতে বোঝানো হয় যে, বাস্তব জীবনের যেকোনো একটি ঘটনা ঘটতে যে সময় লাগে, মঞ্চেও সে ঘটনা সমপরিমান সময়েই ঘটবে।

স্থানের ঐক্য হল– একটি ঘটনাস্থল সাধারণ চোখে যতটুকু দেখা সম্ভবপর মঞ্চে ঠিক ততটুকু ঘটনাস্থলই দর্শকের দৃষ্টিগোচর হবে।

নাটকের কাহিনী বা মূল সুরকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্রের সমাবেশই ঘটনার ঐক্য।

মোট কথা, নাটকের সার্থকতা অভিনয় সফলতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই অভিনেতাদের আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্তিক ভাবের অভিনয়-নৈপুণ্যে নিরূপিত হয় নাটকের সার্থকতা।

পূর্বে নাটকে ঘটনার বিকাশ পাঁচটি অঙ্কে বা পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। যেমন : (১) প্রারম্ভ, (২) প্রবাহ, (৩) উৎকর্ষ, (৪) গ্রন্থিমোচন ও (৫) উপসংহার। কিন্তু আধুনিককালে পাঁচ অঙ্কের কম, তিন অঙ্ক বা শুধু একটি অঙ্কে সমাপ্ত নাটকেরও বহুল প্রচলন লক্ষ করা যায়। তবে নাটক পাঁচ অঙ্কে, তিন অঙ্কে বা এক অঙ্কে, যেভাবেই বিন্যস্ত হোক না কেন, তাতে কাহিনীর উদ্ভব বা উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি একান্তভাবে কাম্য।

নাটকে সংলাপের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্ববহ। সংলাপই নাটকের প্রধান বাহন। চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনে বা চরিত্রের আত্মকথনের মাধ্যমে ঘটনা গতি লাভ করে। সংলাপের মাধ্যমেই আমরা অতীত ঘটনা জানতে এবং পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হই। তা ছাড়া সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয় চরিত্রের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা।

গ. নাটকের শ্রেণীবিভাগ

বিষয়বস্তু অনুসারে নানা ধরনের নাটক হতে পারে। নিচে শ্রেণীবিভাগগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল :

(ক) সামাজিক নাটক

সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কার প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে যে নাটক রচিত হয় তাকে সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটক বলে। সামাজিক নাটক হিসেবে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬); গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'বলিদান'; ম র মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩); দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' (১৯১২) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

(খ) ঐতিহাসিক নাটক

ঐতিহাসিক সত্য ক্ষুণ্ন না করে, ইতিহাস থেকে কাহিনী গ্রহণ করে যে নাটক রচিত হয়, তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলে। তবে এতে সাহিত্যরস বা নাটকীয়তা আনার প্রয়োজনে দু'চারটি কল্পিত চরিত্র বা কাহিনী সন্নিবেশ করা যায়। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১); গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজউদ্দৌলা'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' (১৯০৯) ও 'নূরজাহান' (১৯০৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(গ) পৌরাণিক নাটক

রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য ভারতীয় পুরাণের কাহিনীর আলোকে যে নাটক রচিত, তাকে পৌরাণিক নাটক বলে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০); গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণ বধ', 'পাণ্ডব গৌরব', 'চৈতন্যলীলা'; মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' ও 'সতী' পৌরাণিক নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) রূপক বা সাংকেতিক নাটক

কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে নাট্যকার যে নাটক রচনা করেন, তাকে রূপক বা সাংকেতিক নাটক বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯১৬) রূপক বা সাংকেতিক নাটকের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

(ঙ) গীতিনাট্য

গীতিনাট্য বলতে নৃত্যগীত সংবলিত নাটককে বোঝায়। এ প্রকারের নাটকে গানই প্রাধান্য পায়। এতে নৃত্যের মাধ্যমে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), ও 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭) এ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য নাটক।

(চ) চরিত নাটক

কোনো মহৎ লোকের জীবনী অবলম্বনে যে নাটকের কাহিনী রূপ লাভ করে তাকে চরিত নাটক বলে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজউদ্দৌলা', 'চৈতন্য লীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস', বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর 'শ্রী মধুসূদন' চরিত নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

ঘ. বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রুশ পরিব্রাজক হেরাসিম লেবেদেফের নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের সূত্রপাত। 'চর্যাপদে'ও আমরা নাট্যরসের অস্তিত্ব দেখতে পাই। হেরাসিম লেবেদেফ ও তাঁর মুনশি গোলকনাথ দাস দুজনে মিলে 'Disguise' এবং 'Love is the best doctor' নামে দুটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে লেবেদেফের পরিচালনায় কলকাতায় মঞ্চস্থ ও অভিনীত হয়।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকর্ম শুরু হলেও তারাচরণ শিকদার-এর 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) ও

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক' (১৮৫৪) হতে প্রকৃতপক্ষে মৌলিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে।

বাংলা সার্থক নাট্যসাহিত্যের পথিকৃৎ মূলত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি পাশ্চাত্যের নাট্য-রীতি অনুসারে বাংলা নাটক রচনা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। এ ছাড়া 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) দুটি পৌরাণিক এবং দুটি সার্থক প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) রচনা করেন।

মধুসূদনের সমসাময়িক আর এক জন সার্থক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। তাঁর রচিত 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) বাংলা সাহিত্যের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক। এ ছাড়া 'নবীন তপস্বিনী,' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) প্রভৃতি নাটক ও 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) এবং 'জামাই বারিক' (১৮৭২) নামে তিনটি প্রহসন রচনা করেন।

মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'জমীদার দর্পণ' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। তাঁর অন্য নাটক হল : 'বসন্ত কুমারী' (১৮৭৩) এবং প্রহসন 'এর উপায় কি ?' (১৮৭৬)।

এ ধারার নাটকের পথ পরিক্রমায় পরবর্তীকালে সূচনা ঘটে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, অনেক ঐতিহাসিক নাটকও তিনি রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলোর মধ্যে 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৪), 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৮৮৬) ইত্যাদি জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত উল্লেখযোগ্য প্রহসন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে সাধারণ নাট্যাশালা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) মতো খ্যাতিমান নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতার আবির্ভাব ঘটে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচিত নাটকের সংখ্যা প্রায় ৮০টি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীর কাশিম' (১৯০৬), 'শিবাজী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক; প্রফুল্ল (১৮৯১), 'হারানিধি' প্রভৃতি সামাজিক নাটক এবং প্রহসন হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তিনি কিছু পৌরাণিক নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমসাময়িক অন্য নাট্যকারগণ হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭) ও অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) প্রমুখ।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একাধারে সামাজিক, নৃত্যনাট্য, রূপক নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন রচনা ও অভিনয়ের চূড়ান্ত পরিণতি দানে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তাঁর সামাজিক নাটকের মধ্যে 'শোধবোধ' ও 'বাঁশরী'; রূপক নাটকের মধ্যে 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২); নৃত্যনাট্যের মধ্যে 'নটীর পূজা' (১৯৩৭), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭); প্রহসনের মধ্যে 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৮৯৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬); গীতিনাট্যের মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কাল মৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) নাটক ও গীতিনাট্য রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটক 'ঝিলিমিলি' (১৯৩০) এবং গীতিনাট্য 'আলেয়া' (১৯৩১) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা নাটকের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় নাটকের আঙ্গিক, প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুতে। এ সময়ের নাটকে জীবন সচেতনতা, জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও নানা জিজ্ঞাসার আলোকপাত ঘটে।

সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) রচনা করেন 'সরফরাজ খাঁ', 'মসনদের মোহ', 'আনারকলি'। আকবর উদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮) রচনা করেন 'সিন্ধু বিজয়', 'আজান', 'নাদির শাহ'। ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) রচনা করেন

'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' ও 'কাফেলা'। আবুল ফজল রচনা করেন, 'একটি সকাল', 'আলোক লতা' ইত্যাদি নাটক।

(ঙ) বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের খ্যাতিমান নাট্যকারদের মধ্যে নুরুল মোমেনের (১৯০৬-১৯৮৯) রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'নয়া খান্দান', 'নেমেসিস', 'যদি এমন হতো', 'রূপান্তর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আসকার ইবনে শাইখের (১৯২৫) রচিত ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে 'তিতুমীর', 'অগ্নিগিরি', 'রক্তপদ্ম', 'বিরোধ', 'পদক্ষেপ', 'বিদ্রোহী পদ্মা' ও 'এপার ওপার' উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের নাট্যক্ষেত্রে নিরীক্ষাধর্মী ও আধুনিক নাটক সৃষ্টিতে মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর 'কবর', 'নষ্ট ছেলে', 'মানুষ', 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'দণ্ডকারণ্য', 'পলাশী ব্যারাক' খুবই উল্লেখযোগ্য নাটক। ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের (১৯১৯-১৯৯৮) 'আমলার মামলা' ও 'কাকর মনি' নিরীক্ষাধর্মী নাটক। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) 'সুড়ঙ্গা', 'বহিপীর' ও 'তরঙ্গা ভঙ্গা' নাটকে আঙ্গিকের নিরীক্ষামূলক প্রয়াস লক্ষণীয়। এ ছাড়া অন্য উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৮-১৯৭৫) 'শকুন্তলা উপাখ্যান', 'মহাকবি আলাওল', 'সিরাজউদ্দৌলা'; আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২) 'ইহুদীর মেয়ে', 'মায়াবী প্রহর', 'মরক্কোর যাদুকর'; আনিস চৌধুরীর (১৯২৯-১৯৯০) 'মানচিত্র', 'এ্যালবাম' ইত্যাদি নাটক বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

অতি সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে নানা বিষয়ে নিত্যনতুন আঙ্গিকে নাটক রচিত হচ্ছে। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের মধ্যে আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮) রচিত 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'চারদিকে যুদ্ধ', 'অরক্ষিত মতিঝিল', 'সেনাপতি'; মমতাজউদ্‌দীন আহমদ (১৯৩৫) রচিত 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', 'হরিণ চিতা চিল', 'রাজা অনুস্বারের পালা', 'এই সেই কণ্ঠস্বর', 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম', 'ক্ষতবিক্ষত', 'দুই বোন', 'সাত ঘাটের কানাকড়ি', 'খামাখা খামাখা'; সেলিম-আল-দীন (১৯৪৮-২০০৮) রচিত 'সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক', 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন', 'শকুন্তলা'; সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) রচিত 'গণনায়ক', 'নূরলদীনের সারাজীবন', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'; মামুনুর রশীদ (১৯৪৮) রচিত 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'এখানে নোঙর', 'গিনিপিগ' ইত্যাদি সফল নাটক।

চ. 'কবর' নাটক ও নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) আদিবাস নোয়াখালী। তাঁর বাবা খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী (১৮৯২-১৯৭০) ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। মুনীর চৌধুরী তৎকালীন ঢাকার মানিকগঞ্জে ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। ভাইবোনেরা প্রায় সকলেই কৃতী ও স্বতন্ত্র স্বভাবমণ্ডিত।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে মুনীর চৌধুরী প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দুটি পত্র পরীক্ষা না দিয়েই আইএসসি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে ছাত্রাবস্থায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তাঁর রচিত নাটক প্রথমবার মঞ্চস্থ হয়।

১৯৪৬ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজিতে অনার্স ও ১৯৪৭ সালে এম.এ. পাস করেন। ছাত্রজীবনেই মুনীর চৌধুরী প্রগতিশীল আন্দোলন ও চিন্তাধারার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৯ সালে খুলনা ব্রজলাল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৫০ সালে মুনীর চৌধুরী ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে এবং অল্পদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগদান করেন। একই বছরে তিনি বাণিজ্য বিভাগেও খণ্ডকালীন ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মুনীর চৌধুরী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি জননিরাপত্তা

আইনে গ্রেফতার হন। ঢাকা জেলে থাকাকালীন সময়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এই জেলে বসেই মুনীর চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত 'কবর' নাটক রচনা করেন।

জেলখানা থেকে বের হবার পর মুনীর চৌধুরী ১৯৫৪ সালের ১৫ নভেম্বর দ্বিতীয় বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ইংরেজি বিভাগ থেকে বাংলা বিভাগে বদলি হন এবং ১৯৫৬ সালে বাংলা বিভাগের স্থায়ী পদে নিয়োগ পান।

মুনীর চৌধুরী ছিলেন একজন সৃজনশীল ও সম্মোহন সৃষ্টিকারী বাগ্মী অধ্যাপক। বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাঁর ক্লাসে এসে ভিড় জমাতো।

তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার গুণে তিনি একজন কুশলী বক্তা, সফল নাট্যকার ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। শিক্ষক হিসেবেও তিনি একজন আদর্শ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে একনিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন ছাত্রসমাজে শ্রদ্ধার পাত্র।

এই প্রতিভাধর নাট্যকারের স্পর্শে বাংলা নাট্যধারায় এক বিশেষ দ্বার উন্মুক্ত হয়। তাঁর রচিত নাটকগুলোর মধ্যে 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'কবর', 'দণ্ডকারণ্য', 'পলাশী ব্যারাক', 'বংশধর', 'চিঠি' প্রভৃতি মৌলিক সৃষ্টি। অনুবাদক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনূদিত নাটকগুলোর মধ্যে বার্নার্ড শ'র 'ইউ নেভার ক্যান টেল' এর বাংলারূপ– 'কেউ কিছু বলতে পারে না', গলস্ওয়ার্দির 'দি সিলভার বক্স' এর বাংলা রূপ– ' রূপার কৌটা' বিশেষভাবে পাঠক ও দর্শক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। 'মীর মানস' তাঁর বহুল আলোচিত সমালোচনা-গ্রন্থ। বাংলা টাইপ রাইটারের জন্য উন্নতমানের কী-বোর্ড 'মুনীর কী-বোর্ড' তিনিই উদ্ভাবন করেন। বাংলা ভাষার প্রখ্যাত নাট্যকার ও বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব মুনীর চৌধুরী ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসরদের দ্বারা অপহৃত ও শহীদ হন। তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ছ. 'কবর' নাটকের পটভূমি, চরিত্র পরিচিতি ও সার্থকতা

'কবর' নাটিকাটি 'কবর' নাট্যগ্রন্থের (মানুষ, নষ্ট ছেলে ও কবর) তৃতীয় ও শেষ নাটিকা। এ নাট্যগ্রন্থের তিনটি নাটকেই সমসাময়িক ঘটনার আলোকপাত ঘটেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জেলে বসে রচিত হয় 'কবর' নাটক। ন্যায় এবং সত্যের জন্য নিয়ত সংগ্রামশীল মানবাত্মার জয়ের ইতিহাস ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। মানবকল্যাণবিরোধী বিধিনিষেধ উচ্ছেদকল্পে বাংলার কয়েকজন বীর সন্তান ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শাহাদৎ বরণ করেছেন, তারই পটভূমিতে 'কবর' নাটকটির সৃষ্টি। এর রচনাকাল ১৯৫৩ সাল।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২'র ২১ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার আকাশ বাতাস স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে গিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী ছাত্রজনতার মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার প্রমুখ ছাত্রজনতা মৃত্যুবরণ করেন। এ সব মৃতদেহ গোপনে দাফন করার জন্য তৎকালীন শাসকচক্রের দোসরগণ চুপিসারে গোরস্থানে নিয়ে যায়। এ সময় সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি দলের নেতা, তাকে সাহায্যকারী পুলিশ অফিসার হাফিজ, দুর্ভিক্ষে সর্বহারা ঘর-সংসারহীন মুর্দা ফকির, গোরস্তানের গার্ড এবং ভাষা আন্দোলনে নিহত দামাল বীর সন্তানের দুটি কাল্পনিক ছায়ামূর্তির বাদ-প্রতিবাদ ও আদেশ-নির্দেশের সংলাপে জমাট বেঁধেছে 'কবর' নাটকের কাহিনী।

নেতা ও পুলিশ অফিসার হাফিজ চরিত্র দুটি বাংলার শাসক ও শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ। আর মুর্দা ফকির চরিত্রটি আবহমান বাংলার সদাজাগ্রত ও প্রতিবাদমুখর সাহসী সন্তান। সে অকুতোভয়। তার গতিবিধি সর্বত্র অবাধ। কোনো প্রলোভন, কোনো শাসনই তাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে না। সে গোরস্তানে নানা মৃতদেহের প্রকৃত পরিচয় লাভ করে সংগোপনে, সুকৌশলে। সে বুঝতে পারে এ সাধারণ মৃতদেহ নয়, কারণ মৃতের সারা শরীরজুড়ে বারুদের গন্ধ। সারা দেহ বুলেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। সে ঐসব আত্মোৎসর্গী বীরের মৃতদেহের সৎকার প্রত্যাশী। একই কবরে তাদের দাফন করতে দিতে সে রাজি নয়। সে মৃতদেহগুলোকে পুনরায় উঠে এসে মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। এতে

মদ্যপ নেতা এবং পুলিশ অফিসার ভীত হয়। অবশেষে ঐ সব লাশ ছায়ামূর্তি হয়ে তাদের সামনে এসে প্রতিবাদ করে বলে যে, তারা মৃত নয়, জীবিত। তারা কবরে যাবে না, জানায় বাঁচার দাবি। তখন কৌশলের আশ্রয় নেয় ইনস্পেকটর হাফিজ। সে মায়ের ছদ্মবেশে মায়ের কণ্ঠস্বর নকল করে তাদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। মাতৃভক্ত বীর সন্তানেরা তাতে বিচলিত হয় না। তারা ফকিরের ডাকে পুনরায় ফিরে যায় মিছিলে।

এ নাটকে বাংলার আবহমান বীর সন্তানদের কর্তব্যনিষ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছে। তারা মাতৃভূমি, মাতৃভাষাকে যেকোনো মূল্যে সম্মান দিতে ও রক্ষা করতে প্রস্তুত। নাট্যকার তাঁর বলিষ্ঠ সংলাপ রীতি ও প্রয়োগ দক্ষতায় নাটকীয় কাহিনীকে জীবন্ত ও প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। মুনীর চৌধুরীর ছাত্র ও পরবর্তীকালে তাঁর সহকর্মী ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্য দিয়ে আলোচনা শেষ করা যাক :

'কবর' নাটকের পটভূমি ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন। আরউইন শ'র 'বেরি দ্য ডেড' (১৯৩৬) নাটকের প্রভাব সত্ত্বেও এতে মুনীর চৌধুরীর উদ্ভাবন নৈপুণ্য ও রচনাকুশলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। হয়ত স্বল্পপরিসর বলেই মার্কিন নাটকটির চেয়ে বাংলা একাঙ্কিকা বেশি সংযত বলে মনে হয়। মৃত সৈনিকদের বিদ্রোহ ইংরেজি রচনাটিতে প্রত্যক্ষ ও বাস্তবরূপে উপস্থাপিত, আর 'কবর'-এ বাস্তবতার বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছে নেতা ও ইনস্পেকটরের মদ্যপানজনিত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। সেদিক দিয়েও মুনীর চৌধুরীর কৃতিত্ব বেশি।

এই নাটকে চমকপ্রদ রহস্যজাল ও অন্তর্মুখী বিষাদ ভেদ করে উৎকট কৌতুকময়তার অবতারণা আছে। সে কৌতুকময়তা জীবনের প্রতি সুগভীর আসক্তি ও বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। সংলাপের তীক্ষ্নতা ও পারিপাট্য এবং সরসতা ও নাটকীয়তা 'কবরে'র বিশেষ গুণ। পরিহাসতরল আবহাওয়ায় ছদ্মাবরণের সাহায্যে দুটি করুণ দৃশ্যের সাঙ্গীকরণ নাটকীয়তা সৃষ্টিতে বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। এই দুই অংশে এবং মুর্দা ফকিরের বৃত্তান্তে ভাষা আন্দোলনকে অতিক্রম করে মুনীর চৌধুরী আমাদের সামাজিক জীবনের বৃহত্তর দ্বন্দ্বের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করেছেন।

হাজার বছর ধরে

(উপন্যাস)

জহির রায়হান

হাজার বছর ধরে

মস্ত বড় অজগরের মতো সড়কটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে।
মোঘলাই সড়ক। লোকে বলে, মোঘল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিল তখন যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিল এই সড়ক।
দুপাশে তার অসংখ্য বটগাছ। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দীর্ঘকাল ধরে।
ওরা এই সড়কের চিরন্তন প্রহরী।
কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা।
মাঝে মাঝে ধান খেত সরে গেছে দূরে। দুধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি। অথই পানি। শেওলা আর বাদাবনের ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে নাচে অগণিত শাপলার ফুল।
ভোর হতে আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা ছুটে আসে এখানে। এক বুক পানিতে নেমে শাপলা তোলে ওরা। হৈ-হুল্লোড় আর মারামারি করে, গালাগাল দেয় একে অন্যকে। বাজারে দর আছে শাপলার। এক আঁটি চার পয়সা করে।
কিন্তু এমনো অনেকে এখানে শাপলা তুলতে আসে, বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করা যাদের ইচ্ছে নয়।
মন্তু আর টুনি ওদেরই দলে।
ওরা আসে ধল-পহরের আগে, যখন পূর্ব আকাশের শুকতারা ওঠে। তার ঈষৎ আলোয় পথ চিনে নিয়ে চুপি চুপি আসে ওরা। রাতে শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে। টুনি ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকে।
মন্তু নেমে যায় পানিতে।
তারপর, অনেকগুলো শাপলা তুলে নিয়ে, অন্য সবাই এসে পড়ার অনেক আগে সেখান থেকে সরে পড়ে ওরা।
পরীর দিঘির পাড়ে দুজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। শাপলার গায়ে লেগে থাকা আঁশগুলো বেছে পরিষ্কার করে।
মন্তু বলে, বুড়ো যদি জানে তোমারে আমারে মাইরা ফালাইবো।
টুনি বলে, ইস্, বুড়ার নাক কাইটা দিমু না।
নাক কাইটলে বুড়ো যদি মইরা যায় ?
মইরলে তো বাঁচি। বলে ফিক করে হেসে দেয় টুনি, বলে, পাখির মতো উইড়া আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।
বলে আবার হাসে সে, সে হাসি আশ্চর্য এক সুর তুলে পরীর দিঘির চার পাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।
এ দিঘি এককালে এখানে ছিল না।
আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োদের প্রশ্ন করলে তারা মুখে মুখে বলে দেয় এ দিঘির ইতিহাস। কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে। কেউ শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা জেনেছে তার দাদার কাছ থেকে। আর তার দাদা শুনেছে তারও দাদার কাছ থেকে।
সে অনেক বছর আগে। তখন সড়ক ছিল না। কিছুই ছিল না এখানে। শুধু মাঠ, মাঠ আর মাঠ। সীমাহীন প্রান্তর।
বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে, পরীরা নেমে আসত এই পৃথিবীতে। ওরা নাচত, গাইত, খেলত।
লাল পরী, নীল পরী আর সবুজ পরী। পরীদের অনেকের নামও জানা আছে এ গাঁয়ের লোকের। পুঁথিতে লেখা আছে সব।
একদিন হঠাৎ পরীদের খেয়াল হল, একটা দিঘি কাটবে। যার পানিতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতে পারবে ওরা। ডুব দিয়ে, পানি ছিটিয়ে ইচ্ছেমত হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে।
যেই চিন্তা সেই কাজ।
আকাশ থেকে খন্তা কোদাল আর মাটি ফেলবার ঝুড়ি নিয়ে এল ওরা।
বৈশাখী পূর্ণিমার রাত।
রূপোলি জোছনার স্নিগ্ধ আলোয় ভরেছিল এই সীমাহীন প্রান্তর। দক্ষিণের মৃদু বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল পরীদের হাসির শব্দে।
কথায় গানে আর কাজে।

রাত ভোর হবার আগে দিঘি কাটা হয়ে গেল।
পাতাল থেকে কলকল শব্দে পানি উঠে ভরে গেল দিঘি।
সেই দিঘি।
তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম। এক নয়, অনেক।
গভীর রাতে ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম করে গ্রামগুলো।
জোড়া বউকে ঢেঁকির ওপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে বুড়ো মকবুল। পিদিমের শিখাটা ঢেঁকির তালে তালে মৃদু কাঁপে।
মকবুল ধমকে উঠে বউদের, কি, গায়ে শক্তি নেই ? এত আস্তে ক্যান। আরো জোরে চাপ দাও না, হুঁ। এমনভাবে গর্জে উঠে মকবুল, যেন খেতে লাঙল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু জোড়াকে ধমকাচ্ছে সে। হুঁ, হট হট। হুঁ, আরো জোরে। আরো জোরে ধমক খেয়ে ঢেঁকিতে আরো জোরে চাপ দেয় ওরা। টুনি আর আমেনা। পাশের বাড়ি থেকে আম্বিয়ার গান শোনা যায়। 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেল চইলারে। দুধের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেল বইলারে।'
ঢেঁকিতে চড়লেই গান গাওয়ার সখ চাপে আম্বিয়ার। সতেরো আঠারো বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি ওর। চেহারায় মাধুর্য আছে। চোখ জোড়া বড় বেশি তীক্ষ্ণ। ঢেঁকিতে চড়লে, ঢেঁকিকে আর সুখ দেয় না ও। এত দ্রুত তালে ধান ভানতে থাকে, মনে হয় ঢেঁকিটাই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।
ধান ভানা শেষ হলে গায়ে দর দর ঘাম নামে ওর। একটা চাটাইয়ের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে জোরে শ্বাস নেয় আম্বিয়া।
ঢেঁকির পাশে বসে এই মুহূর্তে বারবার আম্বিয়ার কথা মনে পড়ছিল বুড়ো মকবুলের। দাঁত মুখ খিঁচে বউদের আবার ধমক মারল ও, শুনছনি, আম্বিয়া কেমন ধপাস ধপাস কইরা ধান বাইনতাছে। আর তোরা, কিছু না কিছু না, বলে বার কয়েক মাটিতে থুথু ফেললো মকবুল। বাঁ হাতে কপালের ঘামগুলো মুছে নিল সে। দাওয়ার ওপাশে পিদিম হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল ফকিরের মা। সেখান থেকে বলল, আহা মকবুল! বউগুলারে বুঝি এই রাতের বেলাও আর শান্তি দিবি না তুই। সারাদিন তো খাটাইছস, এহন এই দুপুর রাইতেও-, বলে টুনি আর আমেনার জন্য আফসোস করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেল ও।
এ বাড়িতে মোট আট ঘর লোকের বাস।
সামনে নুয়ে পড়া ছোট ছোট ঘরগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। বাঁশের তৈরি বেড়ার ভাঙা অংশগুলো তালপাতা দিয়ে মোড়ান। চালার স্থানে স্থানে খড়কুটো উঠে ফুটো হয়ে গেছে। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একবার করে সে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতরে। আম কাঁঠাল পাটি পাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ। মাঝে মাঝে ছোট বড় অনেকগুলো সুপুরি আর নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে অনেক আগে। দুএকটা খেজুর গাছও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। ছোট পুকুর। পুকুরে শিং কই আর মাগুর মাছের কমতি নেই। দিনরাত শব্দ করে ঘাই দেয় ওরা। পানিটাকে সারাক্ষণ ঘোলাটে করে রাখে। সামনে মাঝারি উঠোন। শীত কিংবা গ্রীষ্মে শুকিয়ে একরাশ ধুলো জমে। বর্ষায় এক হাঁটু কাদা। কাদার ওপর ছোট ছোট ব্যাঙ এসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। হাঁস কি মোরগ দেখলেই তাড়া করে ওদের। ধরে ধরে মারে। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে ওর অবস্থাটা কিছু ভালো। মকবুল তিন বিয়ে করেছে। তিন বউই বেঁচে আছে ওর।
বড় বউ আমেনা। কালো মোটা আর বেঁটে। বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছেছে এবার। খুব ঘন ঘন কথা বলে। কথা বলার সময় পোকায় খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ছিটিয়ে সামনের লোকগুলোকে ভিজিয়ে দেয়। পারিবারিক কলহ বাধলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি দেখায়।
মেজ ফাতেমা। দেখতে রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। বছরের তিন মাস পেটের অসুখে ভোগে। ছমাস বাপের বাড়িতে কাটায়। বয়সের হিসাবটা সে নিজেও জানে না। কেউ পনেরো বললেও সায় দেয়। পঁচিশ বললেও মেনে নেয়।
সবার ছোট টুনি। গায়ের রং কালো। ছিপছিপে দেহ। আয়ত চোখ। বয়স তার তের-চৌদ্দর মাঝামাঝি। সংসার কাকে বলে সে বোঝে না। সমবয়সী কারো সঙ্গে দেখা হলে সব কিছু ভুলে মনের সুখে গল্প জুড়ে দেয়। আর হাসে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।

বুড়ো মকবুলের পরিবারে আরো একজন আছে।
নাম তার হীরন। ও তার বড় মেয়ে। বড় বউ-এর সন্তান। এবার দশ ছেড়ে এগারোয় পড়লো সে। এখন থেকে মকবুল ওর বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। দুএক জায়গায় এর মধ্যে সম্বন্ধও পাঠিয়েছে সে। বড় মেজ আর ছোট এই তিন বউ নিয়ে মকবুলের সংসার। তিন বউকে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমিজমা নেই ওর। আসলে বউদের আয় দিয়ে চলে ও। বড় দুই বউ দিব্যি আয় করে। বাজার থেকে পাতা কিনে এনে দিয়েই খালাস মকবুল। দুই বউ মিলে একদিনে তিন চারটে চাটাই বুনে শেষ করে। মাঝে মাঝে টুনিও বসে পড়ে ওদের সঙ্গে, কাজ করে। চাটাইগুলো বাজারে বিক্রি করে লাভের অংশ দিয়ে পেঁয়াজ, লঙ্কা আর পান-সুপুরি কেনে মকবুল।
ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও। বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির ওপরে যে ছোট জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল। নিজেও সঙ্গে থাকে। মাটি কুপিয়ে কুমড়ো আর শিমের গাছ লাগায়। দু'বেলা জল ঢেলে গাছগুলোকে তাজা রাখে। সুখ আছে আবার সুখ নেইও মকবুলের জীবনে। তিন বউ যখন ঝগড়া বাধিয়ে চুল ছেঁড়ার লড়াই শুরু করে তখন বড় বিস্বাদ লাগে ওর। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে তিন জনকে সমানে মারে সে। কাউকে ছাড়াছাড়ি নেই।
মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মার।
তার পাশেরটা আবুলের।
তার পাশে থাকে রশিদ।
পাশাপাশি তিনটে ঘর।
সবার দক্ষিণে যে ঘরটা সবার চেয়ে ছোট, ওটায় থাকে মন্তু। একা মানুষ। বাবা মা ভাইবোন কেউ নেই। বাবাকে হারিয়েছে ও জন্মের মাসখানেক আগে। মাকে, দশ বছর বয়সে। লোকে বলে মন্তু নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজি। স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মতো।
টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি এ জন্মে আর দেখেনি সে।
আহা অমনটি আর হয় না।
ওপাশে আর কোনো ঘর নেই।
পশ্চিমের সারে, দক্ষিণের ঘরটা মনুর।
তার পাশে থাকে সুরত আলী।
তার পাশে গনু মোল্লা।
গনু মোল্লা নির্ভেজাল মানুষ। কারো সাতেও থাকে না, পাঁচেও না। জমিজমা নেই। চাষবাসের প্রশ্ন উঠে না। সারাদিন খোদার এবাদত করে। যেখানে যায় তসবির ছড়াটা হাতে থাকে ওর। আপন মনে তসবিহ পড়ে। দিঘিকে কেন্দ্র করে এই গ্রাম।
কখন কোন যুগে পত্তন ঘটেছিল এ গ্রামের কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু, এ বাড়ির পত্তন বেশি দিন আগে নয়। আশি কি খুব জোর নব্বই বছর হবে।
সেই তেরশ সনের বন্যা।
অমন বন্যা দুচার জন্মে কেউ দেখেনি।
মাঠ ভাসল, ঘাট ভাসল, ভাসল বাড়ির উঠান। ঘর ভাসল, বাড়ি ভাসল, ভাসল কাজির কুশান।
কিছু বাদ নেই। ঘরবাড়ি গোয়াল গরু সব। এমনকি মানুষও ভাসল। জ্যান্ত মানুষ। মরা মানুষ।
তাল গাছের ডগায় ঝোলান বাবুই পাখির বাসায়ও কিছুকালের জন্য পরম নিশ্চিন্তে ঘর বেঁধেছিল পুঁটি মাছের ঝাঁক।
রহমতগঞ্জ কুলাউড়া নিজামপুর ভেসে সব একাকার হল।
বুড়ো কাশেম শিকদার ছিল কুলাউড়ার বাসিন্দা।
বুড়ো আর বুড়ি। ছেলেপিলে ছিল না ওদের। মাটির নিচে পুঁতে রাখা টাকা ভরা কলসিটা বুকে জড়িয়ে ধরে বানের জলে ভাসান দিল বুড়ো আর বুড়ি।
কলা গাছের ভেলায় চারদিন চাররাত। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। একেবারে উপোস। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ভেলা ভাসছে আর ভাসছে।

অবশেষে এসে ঠেকল এই দিঘির পাড়ে।
লাল পরী নীল পরী আর সবুজ পরীর দিঘি। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো উঁচু যার পাড়।
গ্রামটা পছন্দ হয়ে গেল কাশেম শিকদারের।
কলসি থেকে টাকা বের করে দু'চার বিঘে জমি কিনে ফেলল সে, গোড়াপত্তন হল এ বাড়ির।
বাড়ির চারপাশে আম কাঁঠাল সুপুরি আর নারকেলের গাছ লাগাল কাশেম শিকদার। পুকুর কাটল। ভিটে বাঁধল। পছন্দ মতো ঘর তুললো বড় করে। কিন্তু মনে কোনো শান্তি পেল না সে। ছেলেপুলে নেই। মারা গেলে কে দেখবে এত বড় বাড়ি।
মাঝে মাঝে চিন্তায় এত বিভোর হয়ে যেত যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকত না তার। বুড়ি ছমিরন বিবি লক্ষ করতেন সব। বুঝতেন কেন স্বামীর মনে সুখ নেই, চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। মনে মনে তিনিও দুঃখ পেতেন।
তারপর, একদিন জলভরা চোখে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ছমিরন বিবি।
আস্তে করে বললেন, তুমি আর একডা নিকা কর। বলতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। দুগণ্ড বেয়ে অবিরাম পানি গড়িয়ে পড়ছিল।
তবু স্বামীকে নিজ হাতে সাজিয়ে দিলেন ছমিরন বিবি। হাতে মেহেদি দিলেন। মাথায় পাগড়ি পরালেন। নতুন বউয়ের দিকে তাকাতে সাহস পেলেন না ছমিরন বিবি। ছুটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে কে যেন তখন কলজেটা কুটিকুটি করে কাটছিল তার। নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তিনি। পুকুর পাড়ে ধুতরা ফুলের সমারোহ। গুণে গুণে চারটে ফুল হাতে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো মুখে পুরে দিয়ে নীরবে ঘুমিয়ে পড়লেন। দিঘির পাড়ে উঁচু টিপির মতো তার কবরটা আজো চোখে পড়ে সবার আগে।

।। দুই ।।

ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম শিকদার বাড়ি।
ঘুমে ঢুলুঢুলু বউ দুটোর গা বেয়ে দরদর ঘাম নামে। এতক্ষণে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। আঁচলটা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে, সামনে হাত রাখার বাঁশের ওপরে গুটিয়ে রেখেছে দুইজনে। মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে বুক আর গলার ঘাম মুছে নিচ্ছে। ঘামে কাপড়টা চপ চপ করছে ওদের।
সেদিকে খেয়াল নেই মকবুলের। ও ভাবছে অন্য কথা।
বাড়ির ওপরের জমিটাকে লাঙল না দিলে নয়। অথচ হাল যে একটা ধার পাবে সে সম্ভাবনা নেই। লাঙল অবশ্য যা হোক একটা আছে ওর। অভাব হল গরুর। গরু না হলে লাঙল টানবে কিসে। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়; মকবুল ভাবল, বউ দুটোকে লাঙলে জুড়ে দিয়ে, দূর এটা ঠিক হবে না। লোকে গালাগাল দেবে ওকে। বলবে, দেহ, বউ দুইডা দিয়া লাঙল টানায়। তার চেয়ে এক কাজ করলে কি ভালো হয় না ? না। বউদের দিয়েই লাঙল টানাবে সে। দিনে নয়, রাতে। বাইরের কোনো লোকে দেখবার কোনো ভয় থাকবে না তখন। বউরা অবশ্য আপত্তি করতে পারে। কিন্তু ওসব পরোয়া করে না মকবুল। মুফত বিয়ে করেনি সে। পুরো চার চারটে টাকা মোহরানা দিয়ে এক একটা বিয়ে করেছে। হুঁ।
ভাবছিল আর সোনারঙ ধানগুলো ঢেঁকির নিচে ঠেলে দিচ্ছিল মকবুল। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ করে হাতটা চেপে ধরল সে। অসতর্ক মুহূর্তে ঢেঁকিটা হাতের ওপর এসে পড়েছে ওর। আল্লারে বলে মুখ বিকৃত করল মকবুল।
টুনি আর আমেনা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঢেঁকির ওপর। ঘোর কাটতে ছুটে নেমে এল ওরা। ওদের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে ওদের গায়ের ওপরে থুথু ছিটিয়ে দিলো মকবুল, দূর-হ দূর-হ আমার কাছ থাইকা। বলতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চাপলো মকবুল।
আমেনা বলল, দেহ কারবার, নিজের দোষে নিজে দুঃখ পাইল আর এহন আমাগোরে গালি দেয়। আমরা কি করছি?
তোরা আমার সঙ্গো শত্রুতামি করছস। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল মকবুল। তোরা দুই সতীনে ইচ্ছা কইরা আমার হাতে ঢেঁকি ফালাইছস। তোরা আমার দুশমন। হ্যাঁ দুশমনই তো। দুশমন ছাড়া আর কি। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল আমেনা। টুনি এগিয়ে গেল ওর ফুলা হাতে একটা ভিজে ন্যাকড়া বেঁধে দেয়ার জন্যে। লাফিয়ে তিন হাত পিছিয়ে

গেল মকবুল। দরকার নাই, দরকার নাই। অত সোয়াগের দরকার নাই। বলে একখানা সরু কাঠের টুকরো নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মারল মকবুল। বিষ উঠছে নাহি বুড়ার ? এমনি করতাছে ক্যান। চাপা রোষে গজগজ করতে করতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল টুনি। খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে ঠান্ডা বাতাসে দেহটা জুড়িয়ে গেল ওর। হঠাৎ মনটা খুশিতে ভরে উঠল। উঠোন থেকে মন্তুর ঘরের দিকে তাকাল ও। একটা পিদিম জ্বলছে সেখানে। একবার চারপাশে দেখে নিয়ে মন্তুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল টুনি।

মাচাঙের ওপর থেকে কাঁথা বালিশটা নামিয়ে নিয়ে শোবার আয়োজন করছিল মন্তু। টুনি দোরগোড়া থেকে বলে, বাহ, বারে !

মন্তু মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে, ক্যান কি অইছে ?

টুনি ফিসফিসিয়ে বলে, আজ যাইবা না ?

মন্তু অবাক হয়, কই যামু ?

টুনি মুখ কালো করে চুপ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে ক্যান ভুইলা গেছ বুঝি ?

মন্তুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বেড়ার সঙ্গে ঝোলান মাছ ধরার জালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে, অ- মাছ ধরতে ?

যাইবা না ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে টুনি।

মন্তু হেসে বলে, যামু যামু। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে, বুড়ো যদি টের পায় তাহলে কিন্তুক জানে মাইরা ফালাইবো।

হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয় টুনি। মাইররে ডরাও নাকি ?

মন্তু সে কথার জবাব না দিলে টুনি বলে, ভাত খাইছ ?

না ! তুমি খাইছ ?

হুঁ। তুমি গিয়া খাইয়া আস যাও। জলদি কইরা আইসো। বিছানাটা আবার গুটিয়ে রেখে বেড়ার সঙ্গে ঝোলান জালটা মাটিতে নামিয়ে নেয় মন্তু।

ও ঘর থেকে আমেনার ডাক শোনা যায়, টুনি বিবি কই গেলা, খাইতে আহ !

আহি, বলে সেখান থেকে চলে যায় টুনি।

মাসখানেক হল ফাতেমা বাপের বাড়ি গেছে। এখন টুনি একা। রাতের বেলা ইচ্ছেমত যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ালেও ধরবার উপায় নেই। রাত জেগে মাছ ধরাটা ইদানীং একটা নেশা হয়ে গেছে ওদের। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে গ্রামের এ পুকুর থেকে অন্য পুকুরে জাল মেরে বেড়ায় ওরা। হাতে একটা টুকরি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে টুনি। জালে ওঠা মাছগুলো ওর মধ্যে ভরে রাখে।

পর পুকুরের মাছ ধরতে গিয়ে সমস্ত সময় সজাগ থাকতে হয় ওদের। চারপাশে দৃষ্টি রাখতে হয়। একদিন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল দুজনে। জমীর মুন্সির বড় পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেদিন। আকাশে চাঁদ ছিল কিন্তু চাঁদনি ছিল না। কালো মেঘে ছেয়ে ছিল পুরো আকাশটা।

এক হাঁটু পানিতে নেমে জালটাকে সন্তর্পণে ছুড়ে দিয়েছিলো সে পুকুরের মাঝখানটাতে। শব্দ হয়নি মোটেও। কিন্তু পুকুর পাড় থেকে জোর গলায় আওয়াজ শোনা গেল, কে কে জাল মারে পুকুরে ?

এক হাঁটু পানি থেকে নীরবে এক গলা পানিতে নেমে গেল মন্তু। টুনি ততক্ষণে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। জমীর মুন্সির হাতের টর্চটা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল পুকুরের এপার থেকে ওপারে। মনে মনে বারবার খোদাকে ডাকছিল মন্তু, খোদা তুমিই সব।

একটু পরে পাড়ের ওপার থেকে টুনির চাপা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, এই উইঠা আহ। মুন্সি চইলা গেছে। বলে খিলখিল শব্দে হেসে ওঠে সে। ওর হাসির শব্দে রাগে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে উঠেছে মন্তুর। এমন সময়ে মানুষ হাসতে পারে ?

তারপর থেকে আরো সাবধান হয়ে গেছে মন্তু। গনু মোল্লার কাছ থেকে তিন আনা পয়সা খরচ করে একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে সে। রাতে বিরাতে গাঁয়ের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ানো, বিপদ আপদ কখন কি ঘটে কিছু তো বলা যায় না। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া ভালো। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে, বাজুর ওপরে বাঁধা তাবিজটাকে আজ

একবার ভালো করে দেখে নিল মন্তু। তারপর বুনো লতার ঝোপটাকে দু হাতে সরিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল সে। টুনি পেছন থেকে বলল, বারে, অত জোরে হাঁটলে আমি চলি কি কইরা? মন্তু জালটাকে গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, আস্তে আহ, তাড়া কিয়ের ? টুনি বলে, বারে, আমার বুঝি ডর ভয় কিছুই নাই। যদি সাপে কামড়ায় ? সাপের কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ একটা আঁধি সাপ ফোঁস করে উঠে সরে যায় সামনে থেকে। আঁতকে উঠে দু হাত পিছিয়ে আসে মন্তু। ভয় কেটে গেলে থুথু করে বুকের মধ্যে একরাশ থুথু ছিটিয়ে দেয় সে। পেছনে টুনির দিকে তাকিয়ে বলে, বুকে থুক দাও তাইলে কিচ্ছু অইবো না। কোনো রকম বিতর্কে না এসে নীরবে ওর কথা মেনে নেয় টুনি। কপালটা আজ মন্দ ওদের। অনেক পুকুর ঘুরেও কিছু চিংড়িগুঁড়ো ছাড়া আর কিছু জুটল না। মাছগুলো কেমন যেন সেয়ানা হয়ে গেছে। পুকুরের ধারে কাছে থাকে না। থাকে গিয়ে একেবারে মাঝখানটিতে, এতদূর জাল উড়িয়ে নেয়া যায় না। টুনি বলে থাক, আইজ থাউক, চলো বাড়ি ফিইরা যাই। জালটাকে ধুয়ে নিয়ে মন্তু আস্তে বলে, চল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুলা হাতটা কোলে নিয়ে বসে বসে আবুল আর হালিমার ঝগড়া দেখছিল মকবুল। অনেকক্ষণ কি একটা বিষয় নিয়ে তর্ক চলছে ওদের মধ্যে। দাওয়ায় বসে বসে যা মুখে আসছে ওকে বলে যাচ্ছে আবুল। হালিমাও একেবারে চুপ করে নেই। উঠোনে একটা লাউয়ের মাচা বাঁধতে বাঁধতে দু একটা জবাবও দিচ্ছে সে মাঝে মাঝে।

মকবুল হাতের ব্যথায় মৃদু কাতরাচ্ছিল আর পিটপিট চোখে তাকাচ্ছিল ওদের দিকে। হঠাৎ দাওয়া থেকে ছুটে এসে মুহূর্তে হালিমার চুলের গোছাটা চেপে ধরল আবুল। তারপর কোনো চিন্তা না করে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিল ওর তলপেটে। উঃ মাগো, বলে পেটটা দুহাতে চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল হালিমা। রাগে তখন ফোঁপাচ্ছে আবুল। জানে খতম কইরা দিমু না তোরে। কাইটা রাস্তায় ভাসায় দিমু না। বলে আবার ওর চুলের গোছাতে হাত দিতে যাচ্ছিল আবুল, বুড়ো মকবুল চিৎকার করে উঠল, খবরদার আবুইল্যা, তুই যদি বউয়ের গায়ে আরেকবার হাত তুলছস তাইলে ভালো অইবো না কিন্তুক।

আমার ঘরণীর গায়ে হাত তুলি কি যা ইচ্ছা করি, কইবার কে আঁ ? পরক্ষণে আবুল জবাব দিলো, তুমি যহন তোমার ঘরণীরে তুলাপেডা কর তহন কি আমরা বাধা দিই।

অমন কোণঠাসা উত্তরের পর আর কিছু বলার থাকে না মকবুলের। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এক নজর ওর দিকে তাকালো মকবুল। আবুল তখন ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে চলেছে হালিমাকে। ভিতরে নিয়ে গিয়ে মনের সুখে মারবে। ওর ইচ্ছাটা হয়ত বুঝতে পেরেছিলো হালিমা। তাই মাটি আঁকড়ে ধরে গোঙাতে লাগলো সে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি। আর মাইরো না, মইরা যামু।

আহারে। এরে মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইণ্যা, দরজা খোল, মারিস না আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দু'হাতে ঝাঁপিটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। আবুল একবার তাকাল সেদিকে, কিন্তু ঝাঁপি খুলল না।

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে এর আগে দু দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে।

প্রথম বউটা ছিলো এ গাঁয়েরই মেয়ে। আয়েশা। একটু বেঁটে, একটু মোটা আর রঙের দিক থেকে শ্যামলা। অপূর্ব সংযম ছিল মেয়েটির। আশ্চর্য শান্ত স্বভাব। কত মেরেছে ওকে আবুল। কোনোদিন একটু শব্দও করেনি। একটা সামান্য প্রতিবাদ নেই।

শুধু আড়ালে নীরবে চোখের পানি ফেলত মেয়েটা।

তারপর একদিন ভীষণভাবে রক্তবমি শুরু হল ওর। জমাটবাঁধা কালো রক্ত। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে মারা গেল আয়েশা।

আয়েশা টিকেছিল বছর তিনেক। তার পরেরটা কিন্তু ওর চাইতেও কম। মাত্র দুবছর।

অবশ্য জমিলার মাত্র দু বছর টিকে থাকার পেছনে একটা কারণও আছে। ও মেয়েটা ছিল একটু বাচাল গোছের আর একটু রুক্ষ মেজাজের। সহজে আবুলের কিল চাপড়গুলো গ্রহণ করতে রাজি হত না সে। মারতে এলে কোমরে আঁচল বেঁধে রুখে দাঁড়াত।

বাধা দিতে গিয়ে পরিণামে আরো বেশি মার খেত জমিলা। ও যখন মারা গেল আর ওর মৃতদেহটা যখন গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করছিল সবাই তখন ওর সাদা ধবধবে পিঠের ওপর সাপের মতো আঁকাবাঁকা ফুলে ওঠা রেখাগুলো দেখে শিউরে উঠেছিল অনেকেই। ওরে পাষাইণ্যারে এমন দুধের মতো মাইয়াডারে শেষ করলি তুই। আয়েশা মারা যাবার পর

অবশ্য ভীষণ কেঁদেছিল আবুল। গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিল সারা উঠোনে। পাড়াপড়শিদের বলেছিল, আহা বড় ভালো বউ আছিলো আয়েশা। আমি পাষাইণ্যা তার কদর বুঝলাম না। আহারে এমন বউ আর পামু না জীবনে।

আয়েশার শোকে তিন দিন এক ফোঁটা দানাপানিও মুখে পোরেনি আবুল। তিন রাত কাটিয়েছে ওর কবরের পাশে বসে আর শুয়ে। পাড়াপড়শিরা ভেবেছিল ওর চরিত্রে বুঝি পরিবর্তন এল এবার। এবার ভালো দেখে একটা বিয়েশাদি করিয়ে দিলে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে আবুল।

কিন্তু জমিলার সঙ্গেও সেই একই ব্যবহার করেছে আবুল। একই পরিণাম ঘটেছে জমিলার জীবনেও।

দ্বিতীয় বউয়ের মৃত্যুতে আবুলের গড়াগড়ি দিয়ে কান্নার কোনো মূল্য দেয়নি পড়শিরা। মুখে বিরক্তি এনে বলেছে, আর অত ঢঙ করিস না আবুইল্যা। তোর ঢঙ দেইখলে গা জ্বালা করে।

আমার বউয়ের দুঃখে আমি কাঁদি, তোমাগো গা জ্বালা করে ক্যান ? ওদের কথা শুনে ক্ষেপে উঠে আবুল।

কপালে এক মুঠো ধুলো ছুঁয়ে সহসা একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে সে, এই তওবা করলাম বিয়া শাদি আর করমু না। খোদা, আমারে আর বিয়ার মুখ দেখাইও না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে আবুল।

পড়শিরা গালে হাত দিয়ে বলেছে, ইয়া আল্লা, এই কেমনতর কথা। বউ মারলি তুই, সেই কথা বইল্যা কি শত্রুতামি করলাম নাকি আমরা ? সাচা কথা কইলেই তো মানুষ শত্রু হয়।

ঠিক কইছ বইচির মা, সাচা কথা কইলেই এমন হয়। তা, আমাগো কইবারও বা দরকার কি। ওর বউরে মারুক কি কাটুক, কি নদীতে ভাসাইয়া দিক, আমাগো কি আছে তাতে ?

সেদিন থেকে আবুলের সাতে পাঁচে আর কেউ নেই ওরা।

আজকাল হালিমাকে যখন প্রহর অন্তর একবার করে মারে আবুল তখন কেউ কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে বুড়ো মকবুল এক-আধটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আবুইল্যা, তোর কি মানুষের পরান না, এমন কইরা যে মারছ বউডারে তোর মনে একটুও চোট লাগে না আবুইল্যা ? বউদের অবশ্য মকবুলও মারে। তাই বলে আবুলের মতো অত নির্দয় হওয়াটা মোটেই পছন্দ করে না সে। এ হলো মকবুলের নিজস্ব অভিমত। অপরাধ, এমন কোনো সাংঘাতিক করেনি হালিমা। পাশের বাড়ির নুরুর সঙ্গে কি একটা কথা বলতে গিয়ে হেসেছিল জোরে। দূর থেকে সেটা দেখে গা জ্বালা করে উঠেছে আবুলের। একটা গভীর সন্দেহে ভরে উঠেছে মন।

এমন মনখোলা হাসি তো আবুলের সঙ্গে কোনোদিন হাসেনি হালিমা।

বেহুঁশ হালিমাকে ভেতরে ফেলে রেখে আবুল যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত নেমেছে ওর। পরনের লুঙ্গি দিয়ে গায়ের ঘামটা মুছে নিয়ে দাওয়ার ওপর দম ধরে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিল আবুল। মাটির হুঁকোটাকে নেড়েচেড়ে কি যেন দেখল, তারপর কলকেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

রশীদের বউ সালেহা উঠোনে বসে চাটাই বুনছিল। আবুলকে এদিকে আসতে দেখে সালেহা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ঘরণী যদি মনের মতো না হয় তাইলে কি তারে নিয়ে আর সুখে ঘর করণ যায় ?

আর ভাবী, দুনিয়াদারী আর ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে দুই চোখ যেই দিকে যায় চইলা যাই। বলে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে আবুল। তারপর কলকেটা সালেহার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, চুলায় আগুন আছে ? একটুহানি আগুন দাও।

এই দিই, বলে কলকেটা হাতে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল সালেহা। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল সে। ও কাছে আসতে গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে এসে আবুল বলল, আইজ আর ছাড়ি নাই ভাবী। যতক্ষণ পারছি মারছি। তুমি একটু তেল গরম কইরা মালিশ কইরা দিও ওর গায়ে। হাড্ডি না দুই একখানা ভাইঙ্গা গেছে কে জানে। তাইলে তো বড় বিপদ অইবো। কাম কাজ কত পইর‍্যা রইছে। সব কিছু বন্ধ অইয়া যাইবো।

সেই কথা আগে খেয়াল আছিল না মিয়ার ? সালেহা মুখ বাঁকাল। কাম কাজের যখন ক্ষতি অইবো জান, তহন না মারলেই পাইরতা। মারলা ক্যান।

উঁহু, আবুল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, মারছি ঠিক করছি, না মারলে আস্কারা পাইয়া যাইতো।

আর আস্কারা কি এমনে কম পাইছে ? চারদিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে সালেহা বলল, নূরুর সঙ্গে কি আজকা কথা কইছে ? ওতো রোজ রোজ কথা কয়।

কি ? চোখ জোড়া আবার ধপ করে জ্বলে উঠলো আবুলের, আমারে এতদিন কও নাই ক্যান ?

সালেহা বলল, কি দরকার বাপু আমাগো মিছামিছি শত্রু বইনা। কইতাম গেলে তো অনেক কথাই কইতে অয়। তা কি আর একদিনে শেষ করা যায়।

কি কথা কও ভাবী। খোদার কসম ঠিক কইরা কও। তামাক খাওয়াটা একেবারে ভুলে গেল আবুল। সালেহা আস্তে করে বলল, যাই কও বাপু কারো বদনাম করার অভ্যাসই আমার নাই। কিন্তুক কই কি এই বউডা তোমার বড় ভালো অয় নাই। আমরা তো আয়শারেও দেখছি, জমিলারেও দেখছি। ওরা তো আমাগো হাতের ওপর দিয়েই গেছে। ওগো তুলনা আছিলো না। কিন্তু হালিমার স্বভাব চরিত্র বাপু আমার বড় ভালো লাগে না। বলতে গিয়ে বার কয়েক কাশল সালেহা। কাশটা গিলে নিয়ে আবার সে বলল, ইয়ে মানে, বাইরের মানুষের সঙ্গে হাসাহাসি। একটুখানি লজ্জা-শরমও তো থাকা চাই। কথা শেষে আবুলের রক্তলাল চোখ জোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল সালেহা। একটু ধমকের সুরে বলল, দেইখো বাপু, তুমি আবার মাইয়াডারে মারতে শুরু কইরো না। এমনিতেই বহুত মারছ। এতে যদি শিক্ষা না হয় তাইলে আর এ জন্মেও হইবো না। সালেহার কথাটা শেষ হবার আগে সেখান থেকে চলে গেছে আবুল। কল্‌কেটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে সে। একটু পরে হালিমার কান্নার শব্দ শোনা গেল ঘর থেকে। আবুল আবার মারছে তাকে।

।। তিন ।।

এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠল টুনি।

এত শীঘ্র উঠত না সে, বুড়ো মকবুলের ধমক খেয়ে শুয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে করল না। মনে মনে বুড়োকে এক হাজার একশো অভিশাপ দিল। চোখজোড়া জ্বালা করছে তার। মাথাটা ঘুরছে। ঘরের পাশে ছাইয়ের গাদা থেকে একটা পোড়া কাঠের কয়লা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে দাঁত মাজতে পুকুরের দিকে চলে গেল। এক গলা পানিতে নেমে মন্তু গোসল করছে পুকুরে।

ঘোলাটে পানি আরো ঘোলা হয়ে গেছে।

কতগুলো হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে সাঁতার কাটছে এপার থেকে ওপারে। আর মাঝে মাঝে মুখটা পানিতে ডুবিয়ে চ্যাপটা ঠোঁট দিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ঘাটের এক কোণে এসে নীরবে বসল টুনি। পা জোড়া পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে এক মনে দাঁতন করতে করতে হঠাৎ তার নজরে এল মন্তুর পিঠের ওপর একটা লম্বা কাটা দাগ। মনে হল কিছুক্ষণ আগেই বুঝি কিছুর সঙ্গে লেগে চিরে গেছে পিঠটা। ওমা, বলে মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিল টুনি, এই এই শোন। মন্তুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এইখানটা চিরলো কেমন কইরা, আঁ ?

মন্তু হেসে দিয়ে বলল, গতকাল রাতে সগন শেখের পুকুর পাড়ে একটা বুনো লতার কাঁটা লাগছিল পিঠে।

টুনির চোখজোড়া মুহূর্তে করুণ হয়ে এল। দরদ ভরা কণ্ঠে সে আস্তে করে বলল, চলো কচু পাতার ক্ষির লাগাইয়া বাইন্দা দি, নইলে পাইকা যাইবো, শেষে কষ্ট পাইবা।

মন্তু আবার একগলা পানিতে নেমে যেতে যেতে বলল, দুর কিছু অইবো না আমার।

টুনি কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ মকবুলের উঁচু গলার ডাকে ওর কথায় ছেদ পড়ল।

কই টুনি বিবি, বলি বিবিজানের মুখ ধোয়ন কি এহনো অইলো না নাকি ? রান্নাঘর থেকে চিৎকার করছে বুড়ো মকবুল। কাল রাতে যে ধানগুলো ভানা হয়নি সেগুলো ভানতে হবে এখন। হাত ভেঙে ফুলে গেলেও সহজে বসে থাকার পাত্র নয় মকবুল।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বুড়োর মৃত্যু কামনা করতে করতে ঘাট থেকে উঠে গেল টুনি।

মন্তুর কোনো জমিজমা নেই।

পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। লাঙল চষে। ধান বোনে। আবার সে ধান পাকলে পরে কেটে এনে মালিকের গোলা ভর্তি করে। তারপর ধানের মওসুম শেষ হয়ে গেলে কলাই, মুগ, তিল, সরিষার ক্ষেতে কাজ করে মন্তু। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ও বাড়ি লাকড়ি কাটার চুক্তি নেয়। পাঁচ মণ এক টাকা। কোনো কোনো দিন আট নয় মণ লাকড়িও কেটে ফেলে সে। মাঝে কিছুকাল মাঝি-বাড়ির নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখের সঙ্গে নৌকা বেয়েছিল মন্তু। নৌকায় পাল তুলে অনেক দূরের গঞ্জে চলে যেত ওরা। ওখান থেকে যাত্রী কিংবা মাল নিয়ে ফিরত। ক্ষেতের রোজগারের চেয়ে নৌকায়

রোজগার অনেক বেশি।

মাচাঙের ওপর থেকে আধ ময়লা ফতুয়াটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে মন্তু ভাবল, আজ একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করবে গিয়ে। তখন সন্ধ্যার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে গ্রামের বুকে। মিয়া-বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে তসবিহ হাতে নামাজ পড়তে চলছেন গনু মোল্লা। মোরগ হাঁসগুলো সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর এখন উঠোনের এককোণে এসে জটলা বেঁধেছে। একটু পরে যার যার খোয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে ওরা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল মন্তু। মাঝি-বাড়িটা বেশি দূরে নয়।

সগন শেখের পুকুরটাকে বাঁ দিকে রেখে ডান দিকে মিয়াদের খেজুর বাগানটা পেরিয়ে গেলে দুটো ক্ষেত পরে মাঝি-বাড়ি। বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে মন্তু শেখের গরু ঘরের পেছন থেকে একটা লোম ওঠা হাড় বের করা কালো কুকুর দৌড়ে এসে বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। হেই হেই করে কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলো সে।

দেউড়ির সামনে বাঁশের ওপরে ঝুলিয়ে রাখা সুপুরি পাতার ঝালরের আড়াল থেকে একটা গানের কলি গুন্‌গুন্ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এল আম্বিয়া।

আরে মন্তু ভাই দেহি। কি খবর ?

মন্তু বলল, করিম আছে নাহি ?

মাথার চুলগুলো খোঁপার মধ্যে গুটিয়ে নিতে নিতে আম্বিয়া বলল, আছে।

আইজ কয়দিন থাইকা জ্বর অইছে ভাইজানের।

কি জ্বর ? কহন অইছে ? মন্তুর চোখে উৎকণ্ঠা।

আম্বিয়া আস্তে করে বলল, পরশু রাইত থাইকা অইছে। কি জ্বর তা কইবার পারলাম না।

হুঁ। মন্তু কি যেন চিন্তা করল। তারপর ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতে আম্বিয়া পেছন থেকে ডাকল, চইলা যাও ক্যান ? দেখা কইরা যাইবা না ? আম্বিয়ার পিছু পিছু হোগলার বেড়া দেয়া ঘরটায় এসে ঢুকল মন্তু। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে ম্লান হেসে করিম বলল, মন্তু মিয়া যে, তোমারে তো আইজ-কাল দেখাই যায় না। বাঁইচা আছি না মইরা গেছি তাও তো খোঁজ-খবর নাও না মিয়া।

মন্তু প্রথমে বিব্রত বোধ করল, তারপর বলল, দেখা না অইলে কি অইবো মিয়া খোঁজ-খবর ঠিকই নিই।

কল্‌কেতে তামাক সাজিয়ে এনে হুঁকোটা মন্তুর দিকে বাড়িয়ে দিল আম্বিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করল পান খাইবা ? মন্তু হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে বলল, না থাউক। আপন মনে কিছুক্ষণ হুঁকো টানল সে। তারপর আসল কথাটা আলোচনা করল ওর সঙ্গে। করিম শেখের সঙ্গে আবার কিছুদিনের জন্য নৌকায় কাজ করতে চায় মন্তু।

শুনে খুশি হল করিম। বলল, নাওডারে একটু মেরামত করন লাগব।

কাল পরশু একবার আইসো।

আবার আসবে বলে উঠতে যাচ্ছিল মন্তু।

করিম সঙ্গে সঙ্গে বলল, আহা যাও কই, বহ না।

না। রাইত অইছে যাই এবার।

আম্বিয়া বলল, বহ মন্তু ভাই, চাইরডা ভাত খাইয়া যাও।

এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা পাল্টে একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে আম্বিয়া।

মুখখানা গামছা দিয়ে মুছে এসেছে সে। কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু। ওকে অমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করল আম্বিয়া, দাঁড়াইয়া রইলা ক্যান, বহ না।

মন্তু বলল, না আইজ না। আর একদিন খামু। বলে বাইরে বেরিয়ে এল মন্তু।

পিদিম হাতে দেউড়ি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে গেল আম্বিয়া। মন্তু শুধাল তোমার আব্বা কই গেছে ?

আম্বিয়া বলল, যেই কাজ কইরা বেড়ায় সেই কাজ করতে গেছে। যাইবো আবার কই। ওর গলায় ক্ষোভ।

ওর মুখের দিকে এক নজর তাকাল মন্তু। ওর ক্ষোভের কারণটা সহজে বুঝতে পারল। সাত গ্রামের মরা মানুষকে কবর দিয়ে বেড়ায় নন্তু শেখ। আশপাশের গ্রামে গত ত্রিশ বছর ধরে যত লোক মরছে সবার কবর খুঁড়েছে নন্তু শেখ। এ তার পেশা নয় নেশা।

আম্বিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় নেমে এল মন্তু তখন অনুভব করল বেশ রাত হয়েছে। চারপাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাক। মাঝে মাঝে গাছের মাথায় দু-একটা পাখি হঠাৎ পাখা ঝাঁপটিয়ে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভরা চাঁদ হাসছে খলখলিয়ে। বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই সুরত আলীর সুর করে পুঁথি পড়ার শব্দটা কানে এল মন্তুর।

উঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেঁধেছে একটা। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে একটা পিদিমের আলোতে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত। পুরুষরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও মেয়েরা বসেছে একটু দূরে। যাদের বয়স কম তারা বসেছে আরো দূরে। দাওয়ার ওপরে।

বুড়ো মকবুল গুড়ুক গুড়ুক হুঁকো টানছে আর বারবার প্রশংসা করছে সুরত আলীর পুঁথি পড়ার। বড় সুন্দর পুঁথি পড়ে সুরত আলী। এ গাঁয়ের সেরা পুঁথি পড়ুয়া সে।

আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় পাতায়। কাক ডাকে না। চড়ুই আর শালিক কোনো সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুঁথি পড়ে সুরত আলী। গাজি কালুর পুঁথি। ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।

শুন শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।
কে কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।

উৎকর্ণ হয়ে শোনে সবাই। সুরত আলী পড়ে। ঢুলে ঢুলে সুর করে পড়ে সে। পুরুষেরা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানে। মেয়েরা পান চিবায়। মাঝে মাঝে কমলার পুঁথিটাও পড়ে শোনায় সুরত। কমলার কিচ্ছা বর্ণনা করে সবার কাছে। কিচ্ছা নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিল কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেল তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সঙ্গে। বড় সুখে দিন কাটছিল ওদের।

এক বছর পরে একটা দুধের মতো মেয়ে জন্ম নিল ওদের।

আট বেহারার পালকি চড়ে একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লাল পরী নীল পরী আর সবুজ পরীর দিঘির পাড় দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল কমলা। দিঘি দেখে পালকি থেকে নামল সে। চৈত্র মাসের খর রোদে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল ওর। দিঘির স্বচ্ছ পানি দেখে বড় লোভ হল কমলার। পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে আঁজলা ভরে পানি খেল সে। তারপর যখন উঠতে যাবে, দেখল চুলের মতো সরু কি যেন একটা কড়ে আঙুলের গোড়ায় আটকে রয়েছে। হাত দিয়ে ছাড়াতে গেল। পারল না কমলা। যত টানে তত লম্বা হয় সে চুল। তার এক প্রান্ত পানির ভেতরে, অন্য প্রান্ত কড়ে আঙুলের সঙ্গে গিঁট আঁটা। ছাড়াতেও পারে না কমলা, এগুতেও পারে না। এগুতে গেলে পানির ভেতর চুলে টান পড়ে। কে যেন টেনে ধরে রেখেছে ওটা। চারদিকে হইচই পড়ে গেল।

কত লোক এল। কত লোক গেল।

কত কামার কুমার ওঝা এসে জড়ো হল। কেউ কিছু করতে পারল না। ইস্পাতে তৈরি কুড়োল দিয়েও কাটা গেল না চুলটা। তিন মাস তিন দিন চলে গেল।

তারপরে—এক রাতে স্বপনে দেখিল সুন্দরী
দিঘির পানিতে আছে এক রাজপুরী।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে গেল কমলার। কাঁদল সবাই। বাবা, মা। স্বামী সবাই।

দিঘির পানি থেকে চুলে টান পড়ল এতদিনে। পাতা পানি থেকে হাঁটু পানিতে নেবে গেল কমলা। হাঁটু থেকে বুক। তারপর গলা। ধীরে ধীরে দিঘির পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কমলা সুন্দরী।

চাঁদ হেলে পড়ে পুব থেকে পশ্চিমে।

ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

ঢুলে ঢুলে পুঁথি পড়া শেষ করল সুরত আলী।

হীন মোয়াজ্জেমে কহেরে শুন সর্বজন।
কমলা সুন্দরীর কিচ্ছা হইল সমাপন ॥
ভুল চুক হইলে মোরে লইবেন ক্ষেমিয়া।
দোয়া করিবেন মোরে অধীন জানিয়া ॥

পুঁথি পড়া শেষ হয়। কমলা সুন্দরী আর ভেলুয়া সুন্দরীর জন্যে অনেকে অনেক আফসোস করে মেয়ে-বুড়োরা। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছে আমেনা। টুনির চোখ জোড়াও পানিতে টলটল করে ওঠে। ফকিরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সব খোদার ইচ্ছা, খোদা মাইরবার চাইলে কি না করতে পারে। বুড়ো মকবুল কিছুক্ষণের জন্য হুঁকো টানতে ভুলে যায়। সে চুপ করে কি যেন ভাবে আর নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

।। চার ।।

খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে হাত পা ধোয়ার জন্যে পুকুর ঘাটে চলে যায় মন্তু। অজু করে এসে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে আজ। মাঝি-বাড়ি থেকে ধপাস ধপাস ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।
রাত জেগে আরও ধান ভানছে আম্বিয়া। বড় মিহি কণ্ঠস্বর ওর, বড় সুন্দর গান গায় সে।

ভাটুইরে না দিয়ো শাড়ি,
ভাটুই যাবো বাপের বাড়ি।
সর্ব লক্ষণ কাম চিক্কণ,
পঞ্চ রঙের ভাটুইরে ॥

পুকুর ঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মন্তু। ছোট পুকুরের পূর্ব পাড় থেকে কে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাড়ের দিকে। আবছা আলোতে সব কিছু স্পষ্ট না দেখলেও মেয়েটিকে চিনতে ভুল হল না মন্তুর। আবুলের বউ হালিমা। এত রাতে একা একা কোথায় যাচেছ সে। পশ্চিম পাড়ের লম্বা পেয়ারা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। চারপাশে বার কয়েক ফিরে তাকাল সে। ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মন্তু। হাত-পাগুলো কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে ওর।
পরনের কাপড়টার একটা প্রান্ত পেয়ারা গাছের মোটা ডালটার সঙ্গে বাঁধল হালিমা। আরেকটা প্রান্ত নিজের গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে কি যেন পরখ করল সে।
মন্তুর আর বুঝতে বাকি রইল না, গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে চায় হালিমা
এ দুনিয়াটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে। তাই আর বাঁচতে চায় না ও।
মন্তু এ মুহূর্তে কি করবে ভেবে উঠতে পারছিল না।
হঠাৎ ওকে অবাক করে দিয়ে গলার ফাঁসটা খুলে ফেলে আপন মনে কেঁদে উঠল হালিমা। পেয়ারা গাছটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সে।
হয়ত, বাবা-মার কথা মনে পড়েছে ওর। কিম্বা, দুনিয়াটা অতি নির্মম হলেও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না হয়ত।
এর মধ্যে বার চারেক গলায় ফাঁস পরেছে আর খুলেছে হালিমা। ওর অবস্থা দেখে অতি দুঃখে হাসি পেল মন্তুর। ধীরে ধীরে ওর খুব কাছে এগিয়ে গেল সে। তারপর অকস্মাৎ ওর একখানা হাত চেপে ধরল মন্তু।
একটা করুণ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল হালিমা। বড় বিষণ্ন চাহনি ওর। অনেকক্ষণ কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল দুইজন। ঈষৎ চাঁদের আলোয় মন্তু দেখল, হালিমার নাক আর চোখ দুটো অসম্ভব রকম ফুলে গেছে। এত মার মেরেছে ওকে আবুল। মন্তু শিউরে উঠল। তারপর কি বলতে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চাপা কান্নার সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল হালিমা। বোবা দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল মন্তু।

পুকুর পাড় থেকে ফিরে এসে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। চেয়ে দেখে, ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথির কথাগুলো গুন্‌গুন্ করছে টুনি।

দাওয়া থেকে নেমে এসে টুনি শুধাল, কোথায় গিছলা মিয়া। তোমারে আমি খুঁইজা মরি।

শোবার ঘর থেকে মকবুল আর আমেনার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। রশীদ আর সালেহাও কি নিয়ে যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

সুরত আলীর ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আবুল আর হালিমার ঘরেও কোনো বাতি নেই।

মন্তু সহসা টুনির কথার কোনো জবাব দিল না।

টুনি আরো কাছে এগিয়ে এসে বলল, এহ্‌নি ঘুমাইবা বুঝি ?

মন্তু বলল, হুঁ। শরীরটা আইজ ভালো নাই।

ক্যান, কি অইছে ? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা। জ্বর হয় নাই তো ?

মন্তু বলল, না এমনি খারাপ লাগতাছে।

টুনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে করে বলল, আইজ শাপলা তুলতে যাইবা না ?

মন্তু বলল, আইজ থাক, কালকা যামু।

টুনি কি যেন ভাবল। ভেবে বলল, পরশু দিনকা আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।

তাই নাহি ?

হুঁ। বাপজানের অসুখ, তাই।

অসুখের কথা কার কাছ থাইকা শুনলা ? ওর মুখের দিকে তাকাল মন্তু।

টুনি আস্তে করে বলল, বাপজানে লোক পাঠাইছিল।

অ। উঠোনের মাঝখানে দু'জনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। একটু পরে মন্তু নীরবতা ভাঙল, পরশু থাইকা আমিও নাও বাইতে যাইতেছি।

কোনহানে যাইবা ? টুনি সোৎসাহে তাকাল ওর দিকে।

মন্তু বলল, কোনহানে যাই ঠিক নাই। করিম শেখের নাও। সে যেইহানে নিয়া যায় সেইহানেই যামু।

টুনি বলল, তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌঁছায়া দিবা ? বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল টুনি।

সহসা কোনো জবাব দিতে পারে না মন্তু। তারপর ইতস্তত করে বলে, অনেক রাত অইছে এইবার ঘুমাও গিয়া।

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় মন্তু।

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল মন্তুর।

বাইরের উঠোনে তখন কি একটা বিষয় নিয়ে প্রচন্ড ঝগড়া বাধিয়েছে আমেনা আর সালেহা। অকথ্য ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিচ্ছে ওরা। গনু মোল্লার ঘরের সামনে একটা বড় রকমের ভিড়।

গ্রামের অনেক ছেলে বুড়ো এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। ব্যাপারটা কি প্রথমে বুঝতে পারল না মন্তু। পরে বুড়ো মকবুলের মেয়ে হিরণের কাছ থেকে শুনল সব।

মজু ব্যাপারির মেজ মেয়েটা ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়াবার জন্য ওকে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে সবাই। ব্যাপারির ছোট ভাইকে সামনে পেয়ে মন্তু শুধাল, কি মিয়া ভূতে পাইল কহন, অ্যাঁ ?

ব্যাপারির ভাই আদ্যোপান্ত জানাল সব।

কাল ভোর সকালে পরীর দিঘির পাড়ে শুকনো ডাল পাতা কুড়োতে গিয়েছিল মেয়েটা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল মেয়ে আর ফিরে না। ওদিকে মেয়ের মা তো ভেবেই আকুল। বয়স্কা মেয়ে কে জানে আবার কোন বিপদে পড়ল। প্রথমে ওকে দেখল কাজি বাড়ির থুরথুরে বুড়িটা। লম্বা তেঁতুল গাছের মগডালে উঠে দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে টেনে দিব্যি গান গাইছে মেয়েটা। বুড়ি তো অবাক, বলি লজ্জা শরমের কি মাথা খাইছ ? দিন দুপুরে গাছে নাহি উইঠা গীত গাইবার লাগছ। ও মাইয়্যা, বলি লজ্জা শরম কি সব উইঠা গেছে দুনিয়ার ওপর থাইক্যা ?

বুড়ি যত চিৎকার করে মরে, মেয়ে তত শব্দ করে হাসে। সে এক অদ্ভুত হাসি। যেন ফুরোতেই চায় না। খবর শুনে মজু

ব্যাপারি নিজে ছুটে এল দিঘির পাড়ে। নিচে থেকে মেয়ের নাম ধরে বারবার ডাকল সে। সখিনা, মা আমার নাক-কান কাটিছ না মা, নাইম্যা আয়।

বাবাকে দেখে ওর গায়ের ওপর থুথু ছিটিয়ে দিল সখিনা। তারপর খিলখিল শব্দে হেসে উঠে বলল, আর যামু না আমি। এইহানে থাকুম।

ওমা কয় কি। মাইয়্যা আমার এই কি কথা কয় ? মেয়ের কথা শুনে চোখ উল্টে গেল মজু ব্যাপারির।

থুরথুরে বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সহসা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ল সে, লক্ষণ বড় ভালো না ব্যাপারি।

মাইয়্যারে তোমার ভূতে পাইছে।

খবরদার বুড়ি বাজে কথা কইস না। ওপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল সখিনা। বেশি বকবক করলে ঘাড় মটকাইয়া দিমু।

এ কথার পরে কারো সন্দেহের আর অবকাশ রইল না।

বুড়ি বলল, এ বড় ভালো লক্ষণ নয়, জলদি কইরা লোকজন ডাহ।

লোকজন ডাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ হাঁক-ডাক শুনে ততক্ষণে গ্রামের অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। বুড়ো ছমির মিয়া বলল, দাঁড়ায়া তামাশা দেখতাছ ক্যান মিয়ারা, একজন উইঠ্যা যাও না ওপরে। কে উঠবে, কে উঠবে না তাই নিয়ে বচসা হল কিছুক্ষণ। কারণ, যে কেউ তো আর উঠতে পারে না। এমন একজনকে ওপরে উঠতে হবে, মেয়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার অধিকার আছে যার। অবশেষে ঠিক হল তকু ব্যাপারিই উঠবে ওপরে। মেয়ের আপন চাচা হয় সে। সুতরাং অধিকারের প্রশ্ন আসে না।

তকু ব্যাপারিকে ওপরে উঠতে দেখে ক্ষেপে গেল সখিনা। চিৎকার করে ওকে শাসাতে লাগল সে, খবরদার খবরদার ব্যাপারি, জানে খতম কইরা দিমু। বলে ছোট ছোট ডাল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওর ঘাড়ের ওপরে ছুড়ে মারতে লাগল সে। তারপর অকস্মাৎ এক লাফে দিঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। অনেক কষ্টে দিঘির পানি থেকে পাড়ে তুলে আনা হল তাকে।

কলসি কলসি পানি ঢালা হল মাথার ওপর। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এল সখিনার তখন সে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। তারপর থেকে একটা কথাও বলেনি সখিনা। একটা প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি সে। তাই আজ সকালে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে ওকে যদি ভূতটাকে কোনোমতে তাড়ানো যায়। নইলে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। ব্যাপারির ভাইয়ের কাছ থেকে সব কিছু শুনল মন্তু। গনু মোল্লার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা সাদা কাপড়কে সরষের তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে সেই কাপড়টাকে সখিনার নাকের ওপর গনু মোল্লা ধরেছে আর চিৎকার করে বলছে, কোনহান থাইকা আইছস শিগ্‌গির কইরা ক, নইলে কিন্তুক ছাড়মু না আমি। ক শিগ্‌গির। সখিনা নীরব।

তার ঘাড়ের ওপর চেপে থাকা ভূতটা কোনো কথাই বলছে না।

মন্তু আর দাঁড়াল না সেখানে। ঘরের পেছন থেকে একটা নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করতে করতে পুকুর ঘাটে চলে গেল সে। পুকুর পাড়ের পেয়ারা গাছের নিচে লাউ গাছগুলোর জন্য একটা মাচা বাঁধছে হালিমা। এখন দেখলে কে বলবে যে ওই মেয়েটাই গতকাল রাতে ওই পেয়ারা গাছটার ডালে গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ওর দিকে চোখ পড়তে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার মাচা বাঁধতে লাগল হালিমা।

।। পাঁচ ।।

নৌকাটা ঘাটে বেঁধে রেখে একগাদা কাদা ডিঙিয়ে পাড়ে উঠে আসে ওরা। মন্তু আর করিম শেখ। হাটের এক কোণে মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানে বসে গরম দু'কাপ চা খায়।

হাটের নাম শান্তির হাট। কিন্তু সারাদিন অশান্তিই লেগে থাকে এখানে। দূর দূর বহু দূর গ্রাম থেকে লোক আসে সওদা

করতে। খুচরো জিনিসপত্রের চেয়ে পাইকারি জিনিসপত্রের বিক্রি অনেক বেশি। এখান থেকে মালপত্র কিনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে আর ছোট ছোট হাট বাজারের দোকানিরা দোকান চালায়।

মাঝে মাঝে দুএকটা সার্কাস পার্টিও আসে এখানে। তখন সমস্ত পরগনায় সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে ছেলে বুড়ো মেয়ে এসে জড়ো হয় এখানে। দোকানিদেরও তখন খুশির অন্ত থাকে না। জোর বিক্রি চলে। নদীর পাড়ের ভরাট জায়গাটায় কয়েকটা দোচালা ঘর তুলে নিয়ে সেখানে হোটেল খোলে কেউ। ভিড় লেগেই থাকে। মনোয়ার হাজির সঙ্গে করিম শেখের অনেক দিনের খাতির। এ হাটে এলে একমাত্র হাজির দোকানেই চা খায় করিম। হাজিও বাইরের কোথাও যেতে হলে করিম শেখের নাও ছাড়া অন্য কারো নৌকায় যায় না। চায়ের পয়সা দিতে এলে হাজি একমুখ হেসে শুধাল, কি মেয়া খবর সব ভালো তো ?

করিম শেখ বিরক্তির সঙ্গে বলল, আর খবর, হাঁপানি হয়া মরতাছি।

আহা, ওইডা আবার কখন থাইকা হইল ? হাজির কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। তা মেয়া হাঁপানি নিয়া না বাইরলেই পারতা।

কি আর কইমু ভাই। পেট তো চলে না। করিম শেখ আস্তে করে বলল, পেট তো ঠান্ডা গরম কিছু মানে না।

মন্তুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে করিম।

কিছুক্ষণ হাটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওরা।

তারপর আবার নৌকায়।

যাত্রী নিয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় ওদের। করিম শেখ হাল ধরে বসে থাকে। মন্তু দাঁড় বায়। আকাশটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে দুপাশের গ্রামগুলো। মাঝে মাঝে দুএকটা মিটমিটে বাতি দেখে বোঝা যায় গেরস্থদের বাড়ি গেল একটা। কিম্বা হঠাৎ কোথাও একসার বাতি দুলতে দুলতে এগিয়ে যেতে দেখলে চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায় হাট থেকে ফিরছে ওরা, হাটুরের দল।

মাঝে মাঝে দুএকটা শিয়াল আর অনেকগুলো কুকুরের দলবাঁধা ডাক শোনা যায়। আর উজান নদীর একটানা কলকল শব্দ।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে মন্তু।

গানের সুর বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। করিম শেখ হুঁকোটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে, নাও মিয়া তামুক খাও।

হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নেয় মন্তু। গুড়ুক গুড়ুক টান মারে হুঁকোতে।

তারপর আবার গান ধরে, আশা ছিলো মনে মনে।

গান শুনে করিম শেখের মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখল বুড়ো মকবুলের ঘরের সামনে একটা ছোটখাটো জটলা বসেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করছে মকবুল। বাড়ির সবার চেয়ে বড় সে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সকলকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না বুড়ো। অন্য সবার বেলাও তাই। মকবুলকে জিজ্ঞেস না করে বাড়ির কেউ কোনোদিন কোনো কাজ কারবার করে না। সুরত আলীর সঙ্গে হয়ত রশীদের মনোমালিন্য আছে। আবুলকে হয়ত মকবুল দুচোখে দেখতে পারে না। গনু মোল্লাকে হয়ত দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার অভিশাপ দেয় ফকিরের মা। কিন্তু, বাড়ির মানসম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোনো কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। তখন সবাই এক। একসঙ্গে বসে পরামর্শ করবে ওরা। মন্তুকে আসতে দেখে ওর দিকে একখানা পিঁড়ি বাড়িয়ে দিলো সালেহা, বহ মন্তু মিয়া বহ।

আলোচনার ধারাটা মুহূর্তে বুঝে নিল মন্তু। বুড়ো মকবুলের মেয়ে হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনিদের বাবার বাড়ির গ্রাম থেকে। আজ সন্ধ্যায় টুনিকে নিয়ে যাবার জন্যে ওর বাবার বাড়ি থেকে লোক এসেছিল। সেই দিয়ে গেছে প্রস্তাবটা। জুলু শেখের বেটা কদম শেখ। হাল গরু জমি সব আছে ওদের। খাস গেরস্ত ঘরের ছেলে। বিয়ে একটা অবশ্য করেছিল একবার। মাস তিনেক হলো বউ মারা গেছে।

আমেনা বলছে, অত চিন্তা কইরা আর কি অইবো, পাকা কথা দিয়া দ্যান। গনু মোল্লা বলল, সব খোদার ইচ্ছা। মাইয়ার কপালে যদি সুখ থাকে তাইলে যেইহানে বিয়া দিবা সেইহানেই সুখে থাকব। বড় বেশি বাছবিচার কইরো না।

মকবুল সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল, হ্যাঁ, তাতো ঠিক কথা।

হীরনের বিয়ের কথা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল, মাঝখানে রশীদের বউ সালেহা বলে উঠল, আমাগো মন্তু মিয়ারেও এইবার

একটা বিয়া করাইয়া দ্যান। এককোণে নীরবে বসেছিল মন্তু। ওর দিকে তাকিয়ে সকলে সালেহার কথায় একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠল।
বুড়ো মকবুল গম্ভীর গলায় বলল, হ, ঠিক কথা কইছ সালেহা।
ওর লাইগা একটা মাইয়া দেহন লাগে।
আমেনা বলল, ওর তো বাপ-মা কেউ নাই, আপনেরা আছেন দেইখা শুইনা করায়া দেন বিয়াডা।
সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন মেয়ে নিয়েও আলাপ করল ওরা।
ফাতেমার এক খালাতো বোন আছে। রসুন তার নাম। রসুনের মতো সাদা হলুদে মেশানো গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। বয়স তের চৌদ্দ হবে।
আবুল বলল, ওর মামার এক মেয়ে আছে। দেখতে যেমন হুরপরী। তাই মামা আদর করে পরী বলে ডাকে। শুধু স্বভাবটা যেন একটু কেমন কেমন। তাও তেমন কিছু নয়।
খায় একটু বেশি। আর ঘুমায়। মকবুল পরক্ষণে বলল, ও মাইয়া ঘরে আইনা কাজ নাই মিয়া। আমেনা বলল, অত দূরে দূরে যাইতাছ ক্যান, নিজ গেরামে দেহ না। আমাগো আম্বিয়া কি খারাপ মাইয়া নাহি। ও হইলেই খুব ভালো হয়। দিনরাত গতর খাটাবার পারে। মন্তু মিয়ারে সুখে রাখবো। আম্বিয়ার প্রশ্নে কারো কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। ও মেয়ে গতর খাটাতে পারে এ কথা সত্যি। কিন্তু ঘরের বউ করে আনার মতো মেয়ে ও নয়।
মকবুল বলল, ওগো বংশে হাঁপানি রোগ আছে। শেষে হাঁপানি হইয়া মন্তু মরবো।
মন্তু কিন্তু একটা কথাও বলল না। সে চুপ করে বসে রইল এক কোণে।
আলোচনা অসমাপ্ত রেখে সেদিনের মতো উঠে গেল সবাই।
একটু পরে যে যার ঘরে চলে গেল ওরা।
পিদিম জ্বালিয়ে অবাক হল মন্তু। মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলার ফুল ঝুলছে। বকের মতো সাদা ধবধবে পাতার মাঝখানে হলুদ রঙের কুঁড়ি। ডাঁটাসহ ফুলগুলো মাচাঙ থেকে নামিয়ে নিল মন্তু।
আজ সন্ধ্যায় বাপের বাড়ি চলে গেছে টুনি। যাবার আগে এগুলো রেখে গেছে ওর ঘরে। এক টুকরো ম্লান হাসি জেগে উঠল মন্তুর ঠোঁটের কোণে। ফুলগুলো আবার মাচাঙের ওপর তুলে রেখে বিছানাটা নামিয়ে নিল মন্তু।

।। ছয় ।।

কিছুদিন ধরে শীত পড়তে শুরু করছে।
দিনের বেলা ঈষৎ গরম। শেষ রাতে প্রচণ্ড শীত, হাড় কাঁপুনি শুরু হয়। কাঁথার নিচেও দেহটা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। এ সময়ে বাড়ির সবাই মাটির ভাঁড়ে ভুসির আগুন জ্বেলে মাথার কাছে রাখে। মাঝে-মাঝে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আগুনটাকে উস্কে দেয়। আজকাল ভোর হওয়ার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে যায় মন্তু। সোয়া দু'টাকা দিয়ে কেনা খদ্দরের চাদরটা গায়ে মাথায় মুড়িয়ে নিয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাঝি-বাড়ির দিকে ছোটে সে। কদিন হলো করিম শেখ হাঁপানিতে পড়েছে। সারাদিন খুক খুক করে কাশে আর লম্বা শ্বাস নেয়।
মন্তু বলে, একডা কবিরাজ দেহাও মিয়া।
করিম বলে, কিছু হয় না মিয়া, অনেক দেহাইছি।
আম্বিয়া বলে, হাটে-গঞ্জে যাও ভালো দেইখা ডাকতর দেখাইতে পার না ?
করিম শেখ চুপ করে থাকে, কিছু বলে না। আজ সকালে মাঝি-বাড়ির দিকে সবে রওনা দিয়েছে মন্তু। দাওয়া থেকে মকবুল ডেকে বলল, রাইতের বেলা একটু সকাল কইরা ফিরো মন্তু মিয়া। হীরনের বিয়ার ফর্দ হইব আজই।
বাড়ির সকলকে আজ একটু সকাল সকাল ঘরে ফিরে আসতে বলে দিয়েছে বুড়ো মকবুল। বিদেশ থেকে মেহমানরা আসবে, ওদের খাতির যত্ন করতে হবে। আদর আপ্যায়ন করে খাওয়াতে হবে ওদের। নইলে বাড়ির বদনাম করবে ওরা। মন্তুর ওপরে আর একটা ভার দিয়েছে মকবুল। নাও নিয়ে গিয়ে টুনিকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

দুএক দিনের মধ্যে নবীনগরে যাবে মন্তু। করিম শেখের শরীরটা একটু ভালো হয়ে উঠলেই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে।
পথের দুপাশের ক্ষেতগুলোতে কলাই, মুগ, মটর আর সরষে লাগানো হয়েছে। সারারাতের কুয়াশায় এই সকালে সতেজ হয়ে উঠেছে ওরা। রোদ পড়ে শিশিরের ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে ওদের গায়ে।
মাঝি-বাড়ির দেউড়ির সামনে আম্বিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মন্তুর। পুকুর থেকে এইমাত্র গোসল করে ফিরছে সে। ঘন কালো চুলগুলো থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এখনো পানি ঝরছে। হাতের ভেজা শাড়িটার পানি নিংড়াতে নিংড়াতে আম্বিয়া বলল, মন্তু ভাই হুট কইরা চইলা যাইও না। পিঠা বানাইছি খাইয়া যাইও।
মন্তু বলল, এই সকাল বেলা গোসল করছো তোমার শীত লাগে না ? আম্বিয়া একটু হাসল শুধু। কিছু বলল না।
সারারাত মিয়া-বাড়িতে ধান ভেনেছে সে। এই শীতের রাতেও ধান ভানতে গিয়ে সারা দেহে ঘাম নেমেছে ওর। পুরো গায়ের কাপড়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ। তাই সকাল সকাল গোসল করে নিয়েছে আম্বিয়া। খেয়ে দেয়ে একটু পরে ঘুম দেবে সে। উঠবে সেই অপরাহ্নে । তারপর আবার মিয়া-বাড়িতে যাবে আম্বিয়া। ধান ভানবে, সারারাত।
মন্তুকে একটা পিঁড়িতে বসতে দিয়ে ওর সামনে এক বাসন পিঠা এগিয়ে দিল আম্বিয়া। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে করিম শেখ বলল, খাও মিয়া খাও। বলে আবার কাশতে শুরু করল সে। আম্বিয়া তখন পাশের ঘরে গিয়ে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে। মাঝে মাঝে বুড়ো শেখের সঙ্গে কি যেন কথা বলছে সে। বেড়ার খুপরি দিয়ে ওকে দেখতে লাগল মন্তু। আম্বিয়াকে বিয়ে করবে সে। হোক হাঁপানি। সহসা একটা সিদ্ধান্ত করে বসল সে। করিম শেখ লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, কি মিয়া হাত তুইলা বইসা রইলা যে ? মন্তু তাড়াতাড়ি একটা পিঠা মুখে পুরে দিয়ে বলল, হুঁ হুঁ, এইতো খাইতাছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো বাসনটা শূন্য করে দিল মন্তু। কাঁথাটা ভালোভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে করিম শেখ কাঁপা গলায় বলল, আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচুম না।
আহা অমন কথা কয় না মিয়া। অমন কথা কয় না। পরক্ষণে ওকে বাধা দিয়ে মন্তু বলল, মরণের কথা চিন্তা কইরতে নাই। আয়ু কইমা যায়।
করিম শেখ তবু বিড়বিড় করে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক প্রকাশ করতে লাগল।
রাতে এল ওরা।
বরের মামা, চাচা আরো দু'তিনজন লোক।
হীরনের বিয়ের ফর্দ হবে আজ।
মকবুলের বাইরের ঘরটাতে ফরাস পেতে বসানো হল ওদের।
গনু মোল্লা বসলেন সবার মাঝখানে।
আবুল, রশীদ আর সুরত আলী ওরাও বসল সেখানে। বুড়ো মকবুল প্রথমে আসতে রাজি হয়নি। বলছিল, তোমরা সবাই আছ, ভালো মন্দ যা বুঝ আলাপ কর গিয়ে। আমারে ওর মধ্যে টাইনো না। রশীদ বলল, কি কথা, আপনের মাইয়া আপনে না থাকলে চলব কেমন কইরা ?
ঘরের ভেতর থেকে বরের চাচা হাঁক ছাড়ল, কই, বেয়াই কই, তেনারে দেহি না ক্যান ?
অবশেষে ঘরে এসে এককোণে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল মকবুল। প্রথমে মেহমানদের ভাত খাওয়ান হবে। তারপরে ফর্দ হবে বিয়ের। মন্তু এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিল কখন বুড়ো মকবুলকে কিছুক্ষণের জন্যে একা পাওয়া যায়। তাহলে নিজের বিয়ের কথাটা ওকে বলবে সে। এই শীতে, হ্যাঁ এই শীতেই বিয়ে করে ঘরে বউ আনতে চায় মন্তু। কিন্তু মকবুলকে একা পাওয়া গেল না।
সারা বাড়িতে আজ ভিড়।
রান্নাঘরের ভিড়টা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা সবাই গিয়ে জুটেছে সেখানে। সারাক্ষণ বকবক করছে। কার কথা কে শুনছে কিছু বোঝা যায় না। হাঁড়িপাতিলগুলো একপাশে টেনে নিয়ে বাসন বাসন ভাত বাড়ছে আমেনা।
হঠাৎ মন্তুকে সামনে পেয়ে আমেনা জিজ্ঞেস করল, মানুষ কজন ?

মন্তু বলল, আটজন।

আটজন। আমেনার মাথায় রীতিমত বাজ পড়ল। আটজনের কি ভাত রাঁনছি আমি ? আমি তো রাঁনছি চাইরজনের। তোমার ভাইয়ে আমারে চারজনের কথা কইছিল।

বড় ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে আসছিল মকবুল, কথাটা কানে গেল ওর। পরক্ষণে ভেতরে এসে রাগে ফেটে পড়ল সে। আমি কি জাইনতাম, আটজন আইব ওরা ? বারবার কইরা কইয়া দিছি চাইরজনের বেশি আইসেন না আপনেরা। ওরা তহন মাইনা নিছে। আর এহন বলে– ঠোঁটজোড়া বিকৃত করে একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করল মকবুল।

অইছে অইছে। আপনে আর চিল্লায়েন না, থামেন। মেজ বউ ফাতেমা চাপা গলায় বলল, যান যা আছে তা দিয়ে একবার খাওয়ান। আমরা না হয় পরে খামু।

ফাতেমার কথায় শান্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল মকবুল, মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বলল, তাইলে মন্তু মিয়া তুমি কাইল পরশু একদিন নবীনগর যাও। কেমন ?

মন্তু সংক্ষেপে ঘাড় নাড়ল।

নিজের কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে। সহসা তার মনে একটা নতুন চিন্তা এল। টুনি ফিরে এলে ওকে দিয়ে কথাটা মকবুলকে বলাবে মন্তু।

খাওয়া-দাওয়া শেষে ফর্দ করতে বসল সবাই।

প্রথমে উঠল দেনা-পাওনার প্রশ্নটা।

বরের চাচা ইদন শেখ বলল, অলঙ্কার-পত্র বেশি দিবার পারমু না মিয়া। হাতের দুই জোড়া চুড়ি আর কানের দুইডা ঝুমকা।

গলার আর কমরেরডা দিবো কে ? সুরত আলী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওইগুলোও দিতে অইবো আপনেগোরে।

পায়েরটারে বাদ দিলা ক্যান মিয়া, অ্যাঁ ? আবুল জোরের সঙ্গে বলল, পায়ের একজোড়া মলও দেওন লাগব।

বুড়ো মকবুল নড়েচড়ে বসল। সুরত আর আবুলের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকাল সে।

বরের মামা আরব পাটারী মৃদু হেসে বলল, এই বাজারে এতগুলান জিনিস দিতে গেলে কি কম টাকার দরকার মিয়া। আরো একটু কম-সম কইরা ধরেন। আচ্ছা, পায়েরটা না হয় নাই দিলাম। মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থতা করে দিল রশীদ। বাকিগুলান তো দিবেন ? হ্যাঁ তাই সই। সুরত আলী বলল, সোনার জিনিস তো আর দিবার লাগছে না, রূপার জিনিস দিবেন। তা মন কষাকষির কি দরকার ?

মকবুল কিছুই বলল না। একপাশে বসে রইল চুপ করে।

গনু মোল্লাও নীরব। নীরবে শুধু তসবিহ পড়ছেন ঢুলে ঢুলে।

গহনার কথা শেষ হলে পরে মোহরানার কথা উঠল।

ইদন শেখ বলল, সব ব্যাপারে আপনাগোডা মাইনা নিছি। এই ব্যাপারে কিন্তুক আমাগোডা মানতে অইবো।

আহা কয়েন না শুনি। রশীদ ঘাড় ঝাঁকাল।

ইদন বলল, মোহরানাডা পাঁচ টাকাই ধরেন।

পাঁচ টাহা ? অ্যাঁ, পাঁচ টাহা ? কন কি ? রীতিমত ক্ষেপে উঠল সুরত। মাইয়া কি মাগনা পাইছেন নাহি ? অ্যাঁ। মাইয়ার কি কোনো দাম নাই ?

আহ, দাম আছে বইলাই তো পাঁচ টাহা কইবার লাগছি। নইলে কি আর তিন টাহার উপরে উঠতাম। আবার পাটারীর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল। কণ্ঠস্বরে বিকৃতি এনে সে বলল, সক্কল দিক দিয়াই বাড়াবাড়ি করবার লাগছেন আপনারা। আচ্ছা যান, আরো আট আনা বাড়ায়া দিলাম। মোট সাড়ে পাঁচ টাহা।

না বিয়াই। তা অয় না, অইবো না। এতক্ষণে কথা বলল বুড়ো মকবুল। এত কম মোহরানায় মাইয়ারে বিয়া দিবার পারমু না, বলে হঠাৎ কেঁদে উঠল সে, মাইয়া আমার কইলজার টুকরা বেয়াই। কত কষ্ট কইরা মানুষ করছি। দুহাতে চোখের পানি মুছল মকবুল।

বিশ টাহা যদি মোহরানা দেন তাইলে মাইয়া বিয়া দিমু।

মকবুলের চোখের পানি দেখে অপ্রতিভ হয়ে গেল সবাই। মাঝ রাত পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর সোয়া এগার টাকায় মিটমাট হল সব। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে মেহমানরা বিদায় নিয়ে গেল। মনে মনে খুশি হল মকবুল। সোয়া এগার টাকা মোহরানায় এর আগে এ বাড়ির কোনো মেয়ের বিয়ে হয়নি।

।। সাত ।।

নবীনগরের ছোট খালে এসে নাওয়ের নোঙর ফেলল মন্তু।

খাল পাড়ে উঠে দাঁড়ালে টুনিদের বাড়ির লম্বা নারকেল আর তালগাছগুলো দেখা যায়। আর সেই তাল-নারকেলের বনের ফাঁকে ওদের দেউড়ি ঘরটাও চোখে পড়ে এখান থেকে।

নৌকা থেকে নামবার আগে মুখ হাতটা ভালো করে ধুয়ে নিল মন্তু। পুরনো লুঙ্গিটা পালটে নিয়ে নতুন লুঙ্গিটা পরল, ফতুয়াটা খুলে জামাটা গায়ে দিল সে। তারপর খদ্দরের চাদরটা কাঁধে ফেলে, পুরনো ছাতাটা বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে নৌকা থেকে নেমে এল মন্তু।

কিছুদূর এসে পকেট থেকে টুপিটা বের করল।

আসার সময় বুড়ো মকবুল বারবার করে বলে দিয়েছে, কুটুমবাড়িতে গিয়ে যেন মন্তু এমন কিছু না করে যার ফলে বাড়ির বদনাম হতে পারে। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল মন্তু। পথঘাট জানা আছে ওর। এর আগে মকবুলের বিয়ের সময় একবার এসেছিল সে। দিন তিনেক থেকে গিয়েছে এখানে। রাস্তায় দু'চারজন অপরিচিত লোক ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওকে।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঝাঁক ঝাঁক বাদুড় উড়ে যাচ্ছে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। একটু একটু করে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। এদিকের লোকেরা এর মধ্যে খেজুর গাছ কেটে রস নামাতে শুরু করে দিয়েছে। পথে আসতে তিন চারজন গাছুনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মন্তুর।

ধারালো বাটাল দিয়ে গাছ কাটছে ওরা। তারপর মাটির কলসি ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে আসছে গাছ থেকে।

টুনিদের বাড়ির সামনে এসে যার সঙ্গে মন্তুর প্রথম দেখা হল সে টুনির চাচা মোতালেব শিকদার। সন্ধে বেলা গরু-বাছুরগুলোকে ঠেঙিয়ে গোয়াল ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল সে।

মন্তুকে দেখে হা করে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, মন্তু মিয়া না ? কি মনে কইরা ? মন্তু এগিয়ে এসে পা ধরে সালাম করল ওর। তারপর বলল, ভাইজান পাঠাইছে, টুনু ভাবীরে নিবার লাইগা।

অ। মুখখানা ঈষৎ ফাঁক করে গরুগুলোকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে আবার গোয়াল ঘরের দিকে চলে গেল মোতালেব শিকদার।

একটু পরে আবার ফিরে এল সে। বলল, আয়েন ভিতরে আয়েন। টুপিটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিল মন্তু, তারপর শিকদারের পিছু পিছু ভেতর বাড়িতে এগিয়ে চলল সে।

দেউড়ির পাশে একখানা বাঁশের বেড়া দিয়ে বাইরের লোকদের কাছ থেকে ভেতর বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হয়েছে। তারই পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে অবাক চোখে দেখছে ওরা। ভেতর বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতে মন্তু দেখল, ঘরে দাওয়ায় একটা বাঁশের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে টুনি। সারা মুখে ওর হাসি যেন উপচে পড়ছে। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

মন্তুকে টুনিদের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল শিকদার।

রসুই ঘর থেকে টুনির মা বেরিয়ে এলেন বাইরে। মন্তু সালাম করল তাকে।

মা বললেন, কইরে টুনি। মিয়ারে একখানা জলচৌকি আইনা দে, বউক।

চৌকি এনে দিলে দাওয়ায় বসল মন্তু।

টুনির মা সবার কুশল জানতে চাইল। টুনি কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করল না, শুধু মুখ টিপে বারবার হাসতে লাগল সে।

টুনির মা বলল, টুনি তো কদিন ধইরা যাওনের লাগি উথাল পাতাল লাগাইছে।

উঁ যাইবো। যামু না আমি। সঙ্গো সঙ্গো প্রতিবাদ জানাল টুনি।

মা বলল, দাঁড়ায়া থাইকো না। মিয়ার ওজুর পানি দাও।

মন্তুর জন্যে হাত-মুখ ধোয়ার পানি আনতে চলে গেল টুনি। মা-ও গেল একটু পরে, বলল তরকারিটা নামায়া আই।

চারপাশটা তাকিয়ে দেখছিল মন্তু। এক বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে বাড়িটার। উঠোনের কোণে পাশাপাশি দুটি জাম গাছ ছিল। কেটে ফেলা হয়েছে। রান্নাঘরের এ পাশটা নুয়ে পড়েছে এখন। আগে অমনটি ছিল না। আগে গোয়াল ঘরটা পুকুরের পূর্ব পাশে ছিল, এখন সেটা উত্তর পাশে সরিয়ে আনা হয়েছে।

টুনি এসে এক ঘটি পানি রাখল ওর সামনে আর এক জোড়া খড়ম। বলল, হাত-মুখ ধুইয়া নাও।

মন্তু মুখ হাত ধুয়ে নিলে ওর দিকে একটা গামছা বাড়িয়ে দিয়ে টুনি বলল, চল ভেতরে চল, বাইরে শীত পড়তাছে।

মন্তু কোনো কথা বলল না। শান্ত শিশুর মতো ওকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে গেল সে।

পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। ও পাশেরটাতে মা-বাবা থাকে আর টুনির ছোট ছোট দুই ভাইবোন। এ পাশের ঘরটা দেখিয়ে টুনি মৃদু হেসে বলল, এইডা আমার ঘর।

ওর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা তাকিয়ে দেখল মন্তু। ছোট ঘর মালপত্র ভরা। কয়েকটা বড় বড় মাটির ঘটি এক কোণে রাখা, তার পাশে তিন চারটে বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ি ভর্তি লাল আলু রাখা আছে। দক্ষিণ কোণে একটা কাঠের চৌকি। চৌকির উপরে একটা কাঁথা বিছানো। একটা তেল চিটচিটে বালিশ। চৌকির নিচে দু'টি ছোট ছোট টিনের প্যাটরা। পশ্চিমের বেড়ার সঙ্গো একটা কাঠের তাক বসানো হয়েছে। তাকের উপরে রাখা আছে কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন। তার পাশে বেড়ার সঙ্গো একটা ভাঙ্গা আয়না ঝোলান। উত্তর কোণে একটা দড়ির সঙ্গো ঝুলছে টুনির দু'খানা শাড়ি, একটা ময়লা কাঁথা। তাছাড়া ঘরের ঠিক মাঝখানে চিলে কাঠের সঙ্গো কতগুলো ছিকে। ছিকের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়িপাতিল রাখা। মন্তু মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে নিল পুরো ঘরটার ওপর। টুনি চৌকিটা দেখিয়ে বলল, এইখানে বও।

মন্তু বসল।

কিছুক্ষণ ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টুনি বলল, অমন শুকায়া গেছ ক্যান ?

মন্তু পরক্ষণে বলল, কই না, শুকাই নাই তো।

টুনি মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মন্তুর মনে হল এ ক'মাসে টুনি অনেক পাল্টে গেছে।

রাতে টুনির ঘরে ওর শোবার বন্দোবস্ত হল।

ময়লা কাঁথাটার ওপর ওর একখানা শাড়ি বিছিয়ে দিল। বালিশটাকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। তারপর বলল, আর বইসা থাইকো না শুইয়া পড়।

মন্তু বলল, বেহান রাইতে কিন্তুক রওনা দিতে অইব।

ওর কথা শেষ না হতে শব্দ করে হেসে দিল টুনি।

বলল, ইস, কইলেই অইলো। তারপর একটুকাল থেমেই আবার বলল, সে কম কইরা অইলেও তিন দিন আমাগো বাড়ি বেড়ান লাগব। তারপরে যাওনের নাম।

মন্তু বলল, পাগল অইছ ? তাইলে ভাইজানে মাইরা ফালাইব আমারে। করিম শেখের নাও নিয়ে আইছি–আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে। টুনি বলল, যাই শুই গিয়া, কথা যা অইবার কাল সকালে অইবো। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল সে। কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে একটু পরেই শুয়ে পড়ল মন্তু। করিম শেখের কথা মনে হতে আম্বিয়ার কথাও মনে পড়ছে তার।

এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে টুনিকে সব বলবে মন্তু। টুনি নিশ্চয় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ওকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল মন্তু।

ঘুম ভাঙলো কখন সে ঠিক বলতে পারবে না। কে যেন চাপা স্বরে ওকে ডাকল, এই। সহসা কোনো সাড়া দিল না মন্তু। হঠাৎ ওর হাতখানা শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সে। একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি শোনা গেল, উঃ এই।

পরমুহূর্তে হাতখানা ছেড়ে দিল মন্তু। টুনি ?
ইস, কথা কয়ো না। মায় হুনব। ওর মুখের ওপরে একখানা হাত রাখল টুনি। তারপর মুখখানা আরো নামিয়ে এনে আস্তে আস্তে করে বলল, চুপ শব্দ কইরো না। শোন, চুপচাপ উইড্যা আইও আমার সঙ্গে।
কিছু বুঝে উঠতে পারল না মন্তু। টুনির মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ও। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। একটু পরে টুনির পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এল মন্তু।
বাইরে এসে দেখল টুনির হাতে একটা মাটির কলস। শীতে দু'জনে রীতিমত কাঁপছিল ওরা।
মন্তু প্রশ্ন করল, কি, কি অইছে ?
টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, কিছু অয় নাই, এদিকে আইও। ওর একখানা হাত ধরে অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলল তাকে। বার বাড়িতে এসে মন্তু আবার প্রশ্ন করল, কই চললা ?
বলল, ঘাবড়ায়ো না মিয়া তোমারে মারুম না। বলে আবার চলতে লাগল সে।
এতক্ষণ এত অবাক হয়ে গিয়েছিল মন্তু যে শীতের প্রকোপটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে না যেতে প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁতে লেগে এল ওর।
একটা লম্বা খেজুর গাছের নিচে এসে দাঁড়াল টুনি। কলসিটা মন্তুর হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখ হাতে। তারপর পরনের শাড়িটাকে লুঙ্গির মতো গুটিয়ে নিল সে। মন্তু কাঁপা গলায় শুধালো, কি কর ?
ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না টুনি। নির্বিকারভাবে খেজুর গাছটা বেয়ে ওপরে উঠে গেল সে।
মন্তুর মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে।
একটু পরে এক হাতে রসের হাঁড়িটা নিয়ে অন্য হাতে গাছ বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল টুনি। কলসির মধ্যে রসটা ঢেলে হাঁড়িটা রেখে আসবার জন্য আবার ওপরে যাচ্ছিল টুনি। মন্তু বলল, আরে কি কর। গাছ এখন পিছল। পইড়া যাইবা।
পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসল টুনি। বলল, ইস কত উঠছি। পাশের ঝোপ থেকে দুটো শিয়াল ছুটে এসে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মন্তুর দিকে হা করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখজোড়া অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ওদের। মন্তু একটা ধমক দিতে ছুটে পালিয়ে গেল ওরা।
টুনি নেমে এসে বলল, কারে ধমকাও ?
মন্তু আস্তে করে বলল, শিয়াল।
আরো অনেকগুলো খেজুর গাছ থেকে রস নামিয়ে কলসি ভর্তি করলো ওরা। শীতের রাতে কুয়াশার বৃষ্টি ঝরছে চারদিকে। মাটি ভিজে গেছে। গাছের পাতাগুলোও ভেজা। আশেপাশে তাকাতে গেলে বেশি দূরে দেখা যায় না। কুয়াশার আবরণে ঢেকে আছে চারদিক। হঠাৎ মন্তুর গায়ে হাত দিয়ে টুনি বলল, শীত লাগতাছে বুঝি ?
মন্তু কোনো জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার লাগে না ?
টুনি বলল, উহু। বলে মাথাটা দোলাল সে।
মন্তু বলল, রস দিয়া করবা কি ?
টুনি বলল, সিন্নি রান্দুম।
মন্তু কোনো কথা বলার আগেই টুনি আবার বলল, তোমার নায়ে চল।
মন্তু অবাক হল, নায়ে গিয়া কি করবা ?
টুনি নির্লিপ্ত গলায় বলল, সিন্নি রান্দুম।
মন্তু বলল, পাগল অইছ ?
টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, হুঁ। বলে মন্তুর মুখের দিকে তাকাল সে, কই নাওয়ে যাইবা না ?
মন্তু কঠিন স্বরে বলল, না ?
ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল টুনি। ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তে একটা অবাক কাণ্ড করে বসল সে। হাতের কলসিটা উপরে তুলে মাটিতে ছুঁড়ে মারল। মাটিতে পড়ে মাটির কলসি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রস গড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

কিছুক্ষণের জন্য দুজনে বোবা হয়ে গেল ওরা।
কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না।
মন্তু নীরবে তাকিয়ে রইল ভাঙা কলসির টুকরোগুলোর দিকে। টুনি মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুকুর পাড়ে লম্বা তালগাছগুলোর মাথায় দুটো বাদুড় হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উঠল।
টুনি আস্তে করে বলল, চল ঘরে যাই, চল।
মন্তু কোনো কথা বলল না। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করল শুধু।
পরদিন যাওয়া হল না মন্তুর।
টুনির মা বলল কুটুমবাড়ি আইয়ে নিজের ইচ্ছায়, যায় পরের ইচ্ছায়। ইচ্ছা করলেই তো আর যাইতে পারবা না মিয়া। যহন যাইতে দিমু তহন যাইবা। অগত্যা থেকে যাওয়া হল।
সারাদিন একবারও কাছে এল না টুনি। অথচ সারাক্ষণ বাড়িতে ছিল সে। ঘরদোর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করেছে। ঘাটে গিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে এনেছে। রান্নাবান্না করেছে।
তারপর খাওয়ার সময় মা ডেকে বলছে, কইরে টুনি এইদিকে আয়। মন্তু মিয়াকে ভাত বাইড়া দে। তখন শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে থেকেছে সে।
রাতের বেলা হঠাৎ বেঁকে বসল টুনি। বলল, কাল সক্কাল বেলাই চইলা যামু আমি।
জিনিসপত্র সব গুছাইয়া দাও।
মা বলল, আরো দুইটা দিন থাইকা যা। আবার কবে আইবার পারবি কে জানে।
টুনি বলল, না মন্তু মিয়ার কাম-কাজের ক্ষতি অইয়া যাইতেছে।
মা বলল, না মন্তু মিয়াকে বুঝাইয়া কইছি। হে রাজি আছে।
টুনি তবু বলল, না কাল সক্কালেই চইলা যামু।
পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনলো মন্তু।
পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গেল ওরা।
মন্তু আর টুনি।
ওর বাবা আর চাচা দুই শিকদার খালপাড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল ওদের। সঙ্গে ছোট দুই ভাইবোনও এল আর এল ওদের কালো কুকুরটা।
ছইয়ের মধ্যে টুনির জন্যে কাঁথাটা বিছিয়ে দিয়েছিল মন্তু। তার ওপর গুটিসুটি হয়ে বসল সে।
খালের পাড়ে যতক্ষণ তার বাবা চাচা আর ভাইবোনদের দেখা গেল ততক্ষণ সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টুনি। তারপর মুখখানা ঘুরিয়ে এনে নীরবে বসে রইল।
খাল পেরিয়ে যখন নৌকা নদীতে এসে পড়ল তখন দুপুর হয়ে আসছে।
টুনি এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। মন্তু সারাক্ষণ কথা বলার জন্য আঁকুপাকু করছিল। কিন্তু একবারও সুযোগ দিল না টুনি। উজান নদীতে দাঁড় বেয়ে চলতে চলতে এক সময়ে মন্তু বলল, বাইরে আইয়া বহো গায়ে বাতাস লাগবো।
ও নড়েচড়ে বসল কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এল না।
একটু পরে একটা কাপড়ের পুঁটলি থেকে কিছু চিঁড়া আর এক টুকরো খেজুরে গুড় বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিল টুনি। বলল, বেলা অইয়া গেছে খাইয়া নাও। বলে আবার চুপ করে গেল সে।
মন্তু বলল, তুমি খাইবা না ?
না।
না ক্যান ?
ক্ষিধা নাই।
ঠিক আছে, আমারও ক্ষিধা নাই। বলে আবার দাঁড় বাইতে লাগল মন্তু। নদীর পানিতে দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণ আর কিছুই শোনা গেল না।

ক্ষণকাল পরে টুনি আবার বলল, খাইবা না।
না।
শেষে শরীর খারাপ করবো।
করুক গা। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল মন্তু।
আর বেশিক্ষণ ছইয়ের ভেতর বসে থাকতে পারল না টুনি। অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এল সে, চিঁড়ার বাসনটা তুলে নিয়ে ওর সামনে এসে বসল।
নাও, খাও।
কইলাম তো খামু না।
তাইলে কিন্তু পানির মধ্যে সব ফালাইয়া দিমু আমি। টুনি ভয় দেখাল ওকে।
মন্তু নির্বিকার গলায় বলল, দাও ফালাইয়া।
কিন্তু ফেলল না টুনি। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা শব্দ করে হেসে উঠল সে। হাসির দমকে মাথার ঘোমটাটা খসে পড়ল কাঁধের ওপর।
টুনি বলল, খাও। আমিও খাই। বলে এক মুঠো চিঁড়া মুখের মধ্যে পুরে দিল সে।
মন্তুর মুখেও এক ঝলক হাসি জেগে উঠল। এতক্ষণে টুনির কোলের ওপরে রাখা বাসন থেকে এক মুঠো চিঁড়া নিয়ে সেও মুখে পুরল।
টুনি বলল, গুড় নাও। খাজুরি গুড়।
চিঁড়া খেতে খেতে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সহজ হয়ে এল টুনি।
এক ফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করল, বাড়ি পৌঁছাইতে কতক্ষণ লাগবো ?
মন্তু একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, মাইজ রাতে।
বেশ জোরে দাঁড় বাইছিল মন্তু।
হঠাৎ টুনি বলল, এত তাড়াতাড়ি করতাছ কেন ? আস্তে বাও না।
মন্তু বলল, তাইলে বাড়ি যাইতে তিন দিন লাগবো।
লাগে তো লাগুক না। টুনির কণ্ঠস্বরে পরম নির্লিপ্ততা।
মন্তু কোনো জবাব দিল না।
আঁজলা ভরে নদীর পানি পান করল ওরা। তারপর ছইয়ের বাইরে বসে টুনি দুহাতে নদীর পানি নিয়ে খেলা করতে লাগল। দুপাশে অসংখ্য গ্রাম। একটার পর একটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝে মাঝে রবি-শস্যের খেতে, নারকেল আর ঘন সুপারির বন।
জেলেদের পাড়া।
ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে মাঝ নদীতে এসে জাল ফেলেছে ওরা।
একখানা হাত পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে টুনি বলল, তুমি এইবার জিরাও। আমি দাঁড় টানি।
মন্তু হেসে বলল, পাগল নাকি ?
টুনি বলল, ক্যান ?
মন্তু বলল, অত সহজ না, দাঁড় বাইতে ক্ষেমতার দরকার আছে।
টুনি আবার চুপ করে গেল।
বিকেলের দিকে শান্তির হাটের কাছাকাছি এসে পৌঁছাল ওরা। নদী এখন দম ধরেছে। পানিতে আর সেই স্রোত নেই। একটা থমথমে ভাব। একটু পরে জোয়ার আসবে। তখন আর নৌকা নিয়ে এগোন যাবে না, কূলে এনে বেঁধে রাখতে হবে। তারপর জোয়ার নেমে গিয়ে ভাটা পড়লে তখন আবার নৌকা ছাড়বে মন্তু।
দূর থেকে শান্তির হাট দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে সেখানে।

ওদিকে তাকিয়ে টুনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ওইহানে কি ?
মন্তু বলল, ওইটা শান্তির হাট।
টুনি পানি থেকে হাতটা তুলে নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গি করে বলল, ওইহানে চুড়ি পাওন যায় ? আমারে কিন্না দিবা ?
মন্তুর ইচ্ছে, জোয়ার আসার আগে শান্তির হাটে গিয়ে নৌকা ভিড়াবে। তাই সংক্ষেপে বলল, হুঁ দিমু।
শান্তির হাটে পৌঁছে, একটা নিরাপদ স্থান দেখে নৌকা বাঁধল মন্তু।
নদীর পাড়ে খালি জায়গাটায় তাঁবু পড়ছে একটা। বিচিত্র তার রঙ।
বাইরে ব্যান্ড পার্টি বাজছে খুব জোরে জোরে। চারপাশে লোকজনের ভিড়। হাটের কাছে আসার পর থেকে ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে টুনি।
সেখান থেকে মুখ বের করে হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, ওইহানে কি ?
মন্তু বলল, সার্কাস পার্টি। সার্কাস পার্টি আইছে।
সেদিকে তাকিয়ে থেকে টুনি আবার বলল, সেইটা আবার কি।
মন্তু বলল, নানারকম খেলা দেহায় ওরা। মানুষের খেলা, বাঘের খেলা। আর কত কি ! বাঘের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেল টুনি। কিন্তু পরক্ষণেই বলল, আমারে দেহাইবা ?
মন্তুর কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাটের মধ্যে মেয়ে মানুষ নিয়া যাওয়াটা সমীচীন মনে হল না ওর। তাই বলল, না, তোমার যাইয়া কাজ নাই। তুমি বহ, আমি আইতাছি। ওর চলে যাওয়ার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের বাইরে এল টুনি। বলল, ওমা, আমি একলা থাকবার পারমু না এহানে। তুমি যাইও না।
মুহূর্তে নিরাশ হয়ে গেল মন্তু। ও নিজে এর আগে কোনোদিন সার্কাস দেখেনি। ভেবেছিল এই সুযোগে একবার দেখে নেবে। কিন্তু টুনির কথায় ভেঙে পড়ল সে। সার্কাসের তাঁবুর দিকে চোখ পড়তেই দেখল শুধু পুরুষ নয়, অসংখ্য মেয়ে-ছেলেও দলে দলে এসে ঢুকছে তাঁবুর মধ্যে।
মন্তু কি যেন ভাবল। ভেবে বলল, আহ, দেরি কইরো না, আহ।
ওর পিছু পিছু নিচে নেমে এল টুনি। মাথার ঘোমটাটা সে এক হাত লম্বা করে দিয়েছে। আর সেই ঘোমটার ভেতর দিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে সে।
তাঁবুর সামনে বড় বড় দুটো হ্যাজাক জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। এক পাশে এক দল লোক ব্যান্ড বাজাচ্ছে।
তাঁবুর দরজার উপরে একটা মাচায় চড়ে দুটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে। সারা গায়ে, মুখে নানারকমের রঙ মেখেছে ওরা।
টুনি অবাক হয়ে বলল, ওমা শরম করে না।
মন্তু বলল, শরম করবে ক্যান, ওরা ম্যাইয়া লোক না, পুরুষ মানুষ মাইয়্যা সাজছে।
অ। হা করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল টুনি।
দরজায় দাঁড়ান লোকটার কাছ থেকে তিন আনা দামের দুখানা টিকেট কাটল মন্তু। ভেতরে ঢুকে দেখে ছেলে বুড়ো মেয়েতে তিল ধারণের জায়গা নেই। তাঁবুর একটা কোণে অল্প একটু জায়গা নিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ল ওরা।
কিছুক্ষণের মধ্যে সার্কাস শুরু হয়ে গেল।
প্রথমে একটা মেয়ে দুটো লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা একখানা দড়ির ওপর দিয়ে নির্বিকারভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে হেঁটে চলে গেল।
দর্শকরা হাতে তালি দিয়ে উঠল জোরে।
তারপর আসল বিকটাকার লোক। হাতের মুঠোর ওপরে তিনটে মানুষকে তুলে নিয়ে চরকির মতো ঘোরাতে লাগল সে।
সবাই এক সঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠল।
এরপরে খুব জোরে ব্যান্ড বাজাল কিছুক্ষণ।
তার পরেই এল বাঘ। এসেই একটা হুঙ্কার ছাড়ল সে।
টুনির দুচোখে অপরিসীম বিস্ময়। ঘোমটার ফাঁকে একবার চারপাশের দর্শকের দিকে তাকাল সে। তাকাল মন্তুর দিকে।
তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিল বাঘের ওপর।
সার্কাস শেষ হলে, দুজনের চমক ভাঙল।

ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ঘাটে আসার পথে মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে হয়। মন্তুকে দেখে হাজি দোকান থেকে চীৎকার করে উঠল, আরে মন্তু মিয়া কই যাও, শুন শুন।

মন্তু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল, পারল না।

আরে মিয়া কাজের কথা আছে শুইনা যাও। দুহাতে ওকে কাছে ডাকল মনোয়ার হাজি।

টুনি পেছনে দাঁড়িয়েছিল। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে গেল মন্তু। কাউন্টারে আরো অনেকগুলো লোক কথা বলছিল।

হঠাৎ মনোয়ার হাজি শব্দ করে হেসে উঠে বলল, বাহরে বাহ বিবিজানেরে সঙ্গো নিয়া সার্কাস দেখবার আইছ বুঝি ?

এই শীতেও ঘেমে উঠেছে মন্তু। টুনির দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, ও ভীষণ বিব্রত বোধ করছে।

ক্ষণকাল পরে মন্তু বলল, আরেকদিন আইসা আপনাগো বাড়ি মেহ্‌মান হমু। আইজকা যাই।

ওর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার জন্য কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করল মনোয়ার হাজি। অবশেষে বলল, আরেকদিন কিন্তুক আইবা মিয়া। বলতে বলতে টুনির দিকে তাকাল হাজি।

জোয়ার পড়ে যাওয়ায়, ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। যেখানে নৌকাটা বেঁধে রেখে গিয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে ওটা। মাঝখানের জায়গাটা পানি আর কাদায় ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। ওর ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে অতি সাবধানে আঙুলের নখগুলো দিয়ে মাটি চেপে রাখতে হয়। নইলে যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিচে নামতে গিয়ে অন্ধকারে মন্তুর ফতুয়াটার একটি কোণ শক্ত করে ধরে রেখেছে টুনি। একটু অসতর্ক হতে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল সে। মন্তু ধরে ফেলল। মাথার আঁচলটা কাঁধের ওপরে গড়িয়ে পড়ল, একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করল টুনি। কাঁধের ওপর থেকে মুখখানা সরিয়ে দিতে গিয়ে মন্তু সহসা অনুভব করল, টুনির দুচোখ বেয়ে পানি ঝরছে। নিঃশব্দে কাঁদছে টুনি।

ভাটি গাঙে নাও ভাসিয়ে দিয়ে নীরবে বসে রইল মন্তু। মনটা আজ ভীষণ ভেঙে পড়েছে ওর। সারা দেহে আশ্চর্য এক অবসাদ। সেদিন রাতে রসের কলসিটা ভেঙে ফেলল, তখনও এত খারাপ লাগেনি ওর। আজ কেমন ব্যথা অনুভব করছে সে। বুকের নিচটায়। কলজের মধ্যে।

নৌকার ছইয়ের ভেতরে চুপচাপ বসে রয়েছে টুনি। একটা কথা বলছে না সে, একটু হাসছে না।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরল মন্তু।

বন্ধুরে আশা ছিলো মনে মনে.................

নদীর স্রোত নৌকার গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। যেন বহুদিনের স্নেহের টানকে চিরন্তন করে ধরে রাখার জন্যে প্রাণহীন কাঠের টুকরোগুলোকে গভীর আবেগে বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওরা। টুনি এখনো নীরব।

খালের মুখের কাছে নৌকা থামাতে হল।

ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। পাতা পানিতে নৌকা নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। এখানে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না আবার জোয়ার আসে। জোয়ারের স্রোতে নৌকা নিয়ে ভেতরে চলে যাবে মন্তু। কিন্তু সে এখনো অনেক দেরি। ভোর রাতের আগে জোয়ার আসবে না।

নৌকা থামাতে দেখে টুনি এতক্ষণে কথা বলল, কি, নাও থামাইলা ক্যান ?

হঠাৎ নিজের অজান্তে একটা কথা বলে বসল মন্তু। বলল, বাড়ি যামু না। এইহানে থাকুম আমরা।

ক্যান ? ক্যান ? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

শুনে শব্দ করে হেসে উঠল মন্তু। ওর হাসিটা কাটা বাঁশের বাঁশির মতো শোনাল। নৌকা থেকে নোঙরটা তুলে নিয়ে নিচে নেমে গেল মন্তু। ভালো করে মাটিতে পাতল ওটা। নইলে জোয়ারের প্রথম ধাক্কায় মাঝ নদীতে চলে যাওয়ার ভয় আছে। তারপর পা জোড়া ধুয়ে নিয়ে নৌকায় উঠতে টুনির প্রশ্নের উত্তর দিল মন্তু।

জোয়ার না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে ওদের।

এইহানে ? বলতে গিয়ে চারপাশে তাকাল টুনি।

আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই। দক্ষিণে যতদূর তাকানো যায় অথই পানির ঢেউ। নদী এখানে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে সাগরের দিকে। কয়েকটি জেলে নৌকা মাঝ নদীতে টিমটিম বাতি জ্বালিয়ে জলে পাহারা দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে একে অন্যকে জোর গলায় ডাকছে ওরা। নিশীর বাপ জাইগা আছনি, ও নিশীর বাপরে কুই-কুই।
পশ্চিমে চর পড়েছে। বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে কোনো লোকালয় নেই। শুধু বালু আর বালু। তার ওপরে আরো এগিয়ে গেলে সীমাহীন বুনো ঘাসের বন। দিনের বেলায় অসংখ্য গরু বাছুর নিয়ে রাখাল ছেলেরা আসে এখানে, রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকে সমস্ত প্রান্তর। পুবে ফেলে আসা নদী এঁকে বেঁকে চলে গেছে শান্তির হাটের দিকে।
উত্তরে খাল। খালের পারে অসংখ্য বুনো ফুলের বন। একটু ভালো করে তাকালে ওপারে তৈরী লম্বা সাঁকোটা নজরে আসে এখান থেকে। চারপাশে এক পলক তাকিয়ে চুপ করে গেল টুনি।
ও মাঝি। মাঝি-ও-কু-ই। জেলে নৌকো থেকে কে যেন ডাকল, কোন হানের নাও, অ্যাঁ ?
গলা চড়িয়ে মন্তু জবার দিল, পরীর দিঘি।
জবাব শুনে চুপ করে গেল জেলেটা।
এতক্ষণ নৌকো বেয়ে আসছিল বলে শীতের মাত্রাটা বুঝে উঠতে পারেনি মন্তু। তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্যে এসে ঢুকল সে।
টুনি নড়েচড়ে এক পাশে সরে গেল।
ছইয়ের সঙ্গে ঝোলান হুঁকো আর কল্কেটা নামিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিল মন্তু।
তারপর আবার বেরিয়ে এসে গলুইয়ের উপর আরাম করে বসে তামাক টানতে লাগল।
দক্ষিণ থেকে কনকনে বাতাস বইছে জোরে।
আকাশে মেঘ।
মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আবার মুখ লুকোচ্ছে তাড়াতাড়ি।
টুনি ডাকল, ওইহানে বইসা ক্যান, ভেতরে আহ।
মন্তু কোন জবাব দিল না। আপন মনে হুঁকো টানতে লাগল সে।
টুনি আবার ডাকল, আহ না, বাইরে ঠান্ডা লাগবো।
মন্তু নীরব।
আইবা না ? টুনির কণ্ঠে অভিমান।
বাইরে বেরিয়ে এসে ওর হাত থেকে হুঁকোটা নিল টুনি। চল, ভেতরে গিয়া শুইবা। এবার আর কোনো বাধা দিল না। নিঃশব্দে ছইয়ের ভেতর গিয়া শুয়ে পড়ল সে। ওর গায়ের উপর কাঁথাটা টেনে দিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইল টুনি।
বাইরে কনকনে বাতাস শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে দূর থেকে দূরে। সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে বসে রইল।
ভোরে ভোরে গ্রামে এসে পৌঁছাল ওরা।
মন্তু আর টুনি।
পরীর দিঘির পাড়ে তিনটে নতুন কবর।
দূর থেকে দেখে বুক কেঁপে উঠল তার। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কে মরল ?
ঘোমটার নিচে থেকে টুনিও চোখ বড় বড় করে দেখছিল কবরগুলো। পথে আসতে মাঝি-বাড়ির কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা হতে সব শুনলো মন্তু। প্রথম কবরটা এ গাঁয়ের তোরাব আলীর। আশির উপরে বয়স হয়েছিল ওর। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে চলাফেলা করতে পারত না। মরে বেঁচেছে বেচারা। নইলে আরো কষ্ট সহ্য করতে হত।
দ্বিতীয় কবরটা আসকর ফকিরের। পেটে পিলে হয়েছিল। প্রায়ই রক্তবমি করত। বুড়োরা বলত, শত্রু পক্ষ কেউ নিশ্চয় তাবিজ করেছে, নইলে অমন হবে কেন।
তার পাশের কবরটা হালিমার। আবুলের বউ হালিমা। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মতো তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।
মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল মন্তুর।
হালিমার মৃত্যুর সংবাদে কাঁদতে শুরু করেছে টুনি। ঘোমটার নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ইতস্তত করে মন্তু বলল, কান্দ

ক্যান, কাইন্দা কি অইবে।
বাড়ি ফিরে এলে বুড়ো মকবুল গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করল। একদিন নয়, দুদিন নয়, চার চারটে দিন।
দুশ্চিন্তায় বারবার ঘর-বার করেছে সে। আইতে এত দেরি অইলো ক্যান ? অ্যাঁ।
মন্তু খুলে বলল সব। কুটুম বাড়িতে গিয়ে কুটুম যদি আসতে না দেয় তাহলে কি করতে পারে সে ? তাছাড়া নদীতে যে জোয়ার-ভাটা আসে সেটাও কারো ইচ্ছেমতো চলে না। তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে ওদের। মকবুল শুনলো সব, শুনে শান্ত হলো। তারপর কোদালটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়ির উপরের খেতটার দিকে চলে গেল সে। যাবার পথে আমেনা আর ফাতেমাকে ডেকে গেল মকবুল। মাটি কুপিয়ে সমান করে মরিচের চারা লাগাতে হবে।

।। আট ।।

দেখতে না দেখতে হীরনের বিয়ের দিনটা ঘনিয়ে এল।
একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই আয়োজনের কোনো কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল। সাড়ে আট টাকা দাম দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে সে। হাট থেকে চিকন চাল কিনে এনেছে আর আধ সের ঘি।
মিয়া বাড়ি থেকে কয়েকটা চিনেমাটির পেয়ালা আর বরতন ধার নিয়ে এল আমেনা। বরপক্ষের লোকদের মাটির বাসনে খেতে দিলে ফিরে গিয়ে হয়ত বদনাম করবে ওরা, তাই।
বুড়ো মকবুলের শরীরটা ভালো নেই। চারদিকে ছুটাছুটি করবে সে-শক্তি পাচ্ছে না সে। তাই বাড়ির অন্য সবার ওপরে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়েছে। সুরত আলী, রশীদ, আবুল, মন্তু সবাই ব্যস্ত। বুড়ো শুধু দাওয়ায় একখানা পিঁড়ির উপর বসে তদারক করছে সব। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ভুঁইয়া বাড়ির গড়ের পাশে বড় মেহেদি গাছ থেকে মেহেদি তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।
আমেনা আর ফাতেমা, ঘরদোরগুলো লেপে মুছে ঠিক করে নিচ্ছে।
পুরো উঠোনটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলেছে ওরা।
টুনি পুকুর ঘাটে বাসনপত্রগুলো মাজছে।
যার বিয়ে, সেই হীরন রসুই ঘরের দাওয়ায় চুপটি করে বসে রয়েছে আর অবাক হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবার।
দুপুর রাতে পাড়াপড়শিরা অনেকে এল। কাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল। দুখানা বড় বড় চাটাই বিছিয়ে নিয়ে, উঠোনে বসল ওরা। তারপর সবাই একসঙ্গে সুর করে গান ধরল–

মেহেদি তোমরা লাগ কোন কাজে।
আমরা লাগী দুলহা কইন্যারে সাজে।

ঢেঁকির উপরে তখন আম্বিয়াও গান ধরেছে। বিয়ের ধান ভানতে এসেছে সে। সন্ধ্যা থেকে ঢেঁকির ওপরে উঠেছে ও আর টুনি। তখন থেকে এক মুহূর্তের বিরাম নেই। উঠোনে মেয়েরা গান গাইছিল। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার জন্যে টুনি আর আম্বিয়া দুজনে গলা ছেড়ে গান ধরল।

ভাটুইরে না দিয়ো কলা
ভাটুইর হইবে লম্বা গলা।
সর্ব লইক্ষণ কাম চিক্কন পঞ্চ রঙের ভাটুইরে।

সহসা শব্দ করে হেসে উঠল বুড়ো মকবুল। ওর মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে আজ। জোরে জোরে হুঁকো টানছে আর চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে।
হীরনকে মাঝখানে বসিয়ে ওর হাতে মেহেদি দিচ্ছে সবাই। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে আছে মেয়েটা।
সুরতের ছেলেমেয়ে, কুদ্দুস, পুটি, বিন্তি ওরা হাতে মেহেদি দেবার জন্যে কাঁদাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ধমকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল সালেহা।
মকবুল বলল, আহা তাড়াও ক্যান বউ। একটুখানি মেহেদি ওগোও দাও না।

হঠাৎ ফকিরের মা নাচতে শুরু করল। আঁচল দুলিয়ে, ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল সে।

কই গেলা সুরতের বিবি আমার কথা শোন।
আবের পাখা হাতে করি আউলাইয়া বাতাস কর।
ফুলের পাখা হাতে নিয়া জোরে বাতাস কর।

ওর নাচ দেখে ছেলে বুড়ো সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো একসঙ্গে।
ধান ভানা বন্ধ করে টুনি আর আম্বিয়াও বাইরে বেরিয়ে এল।
আম্বিয়াকে আসতে দেখে নাচ থামিয়ে তার দিকে দৌড়ে এল ফকিরের মা, হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল দলের মাঝখানে। তারপর ওকে লক্ষ্য করে ফকিরের মা গান ধরল।
দৌড়ে গিয়ে মন্তুর ঘরের মধ্যে ঢুকে দুয়ারে খিল দিল আম্বিয়া। সালেহা হেসে বলল, কিরে আম্বিয়া, এত ঘর থাকতে শেষে আমাগো মন্তু মিয়ার ঘরে ঢুইকা খিল দিলি।
মন্তু তখন উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।
ওকে দেখে গ্রামের রসুর নানি তার ফোকলা দাঁত বের করে একগাল হেসে বলল, কি মিয়া ডুইবা ডুইবা পানি খাও। ঘরে গিয়া দেহ কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে।
মন্তু কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ টুনির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সবাই।
তীব্র গলায় সে বলল, কি অইতাছে অ্যাঁ ? কি অইতাছে। কাম কাজ ফালাইয়া কি শুরু করছ তোমরা। অ্যাঁ ?
সহসা সবাই চুপ করে গেল। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। টুনি ততক্ষণে রসুই ঘরের দিকে চলে গেছে।
মন্তু নির্বাক।
দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আম্বিয়া। তার চোখমুখ পাকা লঙ্কার মতো লাল। চিবুক আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু আগেকার সেই আনন্দ উচ্ছল পরিবেশটা আর এখন নেই। ফকিরের মা বিড়বিড় করে বলল, এমন কি কইরছি যে রাগ দেহান লাগছে। বিয়া বাড়ির মধ্যেই হৈ-চৈ না কইরা কি কান্দাকাটি করমু ? সালেহা বলল, আমরা না অয় মন্তু মিয়া আর আম্বিয়ারে নিয়া একটুখানি ঠাট্টা-মস্করা কইরতাছিলাম, তাতে টুনি বিবির এত জ্বলন লাগে ক্যান। ওর কথা শেষ না হতে ঝড়ের বেগে রসুই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল টুনি। কি কইলা অ্যাঁ, কি কইলা অ্যাঁ ? চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ওর। চোখজোড়া জ্বলছে। সালেহা সঙ্গে সঙ্গে বলল, যা কইবার তা কইছি, তোমার এত পোড়া লাগে ক্যান। বলে মুখ ভ্যাংচাল সে।
পরক্ষণে একটা অবাক কাণ্ড করে বসল টুনি। সালেহার চুলের গোছাটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে মাটিতে ফেলে দিল সে। তারপর চোখেমুখে কয়েকটা এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মেরে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল টুনি। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যেতে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সালেহা। মনে হল এ মুহূর্তে ওর মা মারা গেছে। কান্না শুনে এঘর ওঘর থেকে বেরিয়ে এল অনেকে।
মকবুল দাওয়া থেকে চিৎকার করে উঠল, কিরে কি অইলো অ্যাঁ। কি অইলো।
রশীদ, সুরত সবাই ছুটে এল সেখানে।
রশীদ বলল, কি কান্দবি না কইবি কিছু, কি অইছে ? সালেহা কোনো জবাব দিল না।
ফকিরের মা বুঝিয়ে বলল সব।
সালেহার কোনো দোষ নেই। আম্বিয়া আর মন্তুকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল ওরা। টুনি বেরিয়ে এসে হঠাৎ সালেহাকে মেরেছে।
মাইরছে। মাইরছে ক্যান ? রশীদ ক্ষেপে উঠল।
ওকে রাগতে দেখে আরো জোরে কান্না জুড়ে দিল সালেহা।
বুড়ো মকবুল বিব্রত বোধ করল। ইতস্তত করে বলল, মন্তু আর আম্বিয়া কই গেছে ? মন্তুকে ঘরের দাওয়াতে বসে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু আম্বিয়াকে পাওয়া গেল না সেখানে। এই গন্ডগোলের মধ্যে নীরবে এখান থেকে সরে পড়েছে সে।
ফকিরের মা বলল, ওগো কোনো দোষ নাই।

কি ভেবে বুড়ো মকবুল একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আস্তে করে বলল, তোমরা হৈ-চৈ কইরো না। বিয়ার সময় এইসব ভালো না। যা অইছে তার বিচার আমি করমু। খাঁটি বিচার করমু আমি। বলে দাওয়ার দিকে চলে গেল সে। তারপর হুঁকোটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বলল, কই তোমরা চুপ কইরা রইলা ক্যান, গীত গাও, হ্যাঁ গীত গাও। ছেলে-বুড়োরা আবার হৈ-চৈ করে উঠল।

ফকিরের মা আবার গান ধরল।

এক বাটা পান এনে ওদের সামনে নামিয়ে রেখে গেল আমেনা। বলল, খাও। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরনো আবেশটা ফিরে এল আবার। ফকিরের মা নাচতে শুরু করল।

বিয়ের জন্যে কিনে আনা ছাগলটা ঘরের পেছনে ব্যাঁ-ব্যাঁ করে ডাকছে। চোখের কোণজোড়া পানিতে ভিজে উঠেছে ওর। ভোর রাত পর্যন্ত কেউ ঘুমাল না।

তারপর একজন দুজন করে যে যার ঘরে চলে যেতে লাগল। মন্তু সবে তার ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেবে এমন সময় বাইরে থেকে ধাক্কা দিল টুনি। ও কিছু বলার আগে ভেতরে এসে ঢুকল সে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল করে এসেছে। মুখে একটা প্রসন্ন হাসি, হাতে মেহেদি। সঙ্গে একটা মাটির বাটিতে করে আরো কিছু মেহেদি এনেছে সে।

বাটিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে টুনি আস্তে করে বলল, দেহি তোমার হাত দেহি।

মন্তু বলল, ক্যান ?

টুনি বলল, তোমারে মেহেদি দিমু।

মন্তু বলল, না।

টুনি বলল, না ক্যান, বলে ওর হাতটা টেনে নিল সে। মাটিতে বসে ধীরে ধীরে ওর হাতে মেহেদি পরিয়ে দিতে লাগল টুনি। মন্তু কোনো বাধা দিল না। নীরবে বসে শুধু তাকে লক্ষ করে মৃদু হাসল। কিছুক্ষণ পরে টুনি আবার বলল, আমার একটা কথা রাইখবা ?

কি ?

একডা বিয়া কর।

হুঁ।

দুজনে আবার চুপ করে গেল ওরা।

ওর দুহাতের তালুতে সুন্দর করে মেহেদি পরিয়ে দিতে দিতে টুনি আবার বলল, আরেকডা কথা রাইখবা ?

কি ?

আমার পছন্দ ছাড়া বিয়া কইরবা না।

হুঁ। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো মন্তু। টুনি পরক্ষণে ওর হাতটা কোলের ওপরে টেনে নিয়ে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কথা দিলা ? বলে অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকাল টুনি। মন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। বার কয়েক ঢোক গিলল সে।

তারপর হঠাৎ করে বলল, শাপলা তুলতে যাইবা ?

মৃদু হেসে মাথা নাড়াল টুনি। না।

তাইলে চল, মাছ ধরি গিয়া।

টুনি আরো জোরে মাথা নাড়াল, না।

না ক্যান ? মন্তুর কণ্ঠে ধমকের সুর।

টুনি হেসে বলল, লোকে দেইখা ফেলাইলে কেলেঙ্কারি বাধাইবো। বলে উঠে দাঁড়াল সে। মন্তুকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে পরক্ষণে সেখান থেকে চলে গেল টুনি।

বিয়ের পরে ক'টা দিন বাড়িটা একেবারে জনশূন্য মনে হল। ছেলে-বুড়ো প্রায় সবাই চলে গেছে হীরনের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ি। শুধু যায়নি মকবুল আর মন্তু।

মকবুল যায়নি তার অসুখ বলে। প্রায়ই বিকেলে জ্বর আসছে ওর। সকালে একেবারে ভালো।

মন্তুরও শরীরটা ভালো নেই। বিয়ের দিন, রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লাগিয়েছে সে। বুড়ো মকবুল বলেছে, থাক, তোর

গিয়ে কাজ নেই। তুই পরে যাইছ। তাই থেকে গেছে সে।
বাড়ির মেয়েছেলেরা ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছে খুব। বিয়ের সময়ে দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি কেউ, তাই।
বুড়ো মকবুল সাবধান করে দিয়েছে ওদের, অমন করে ঘুমায়ো না তোমরা, চোর আইসা সর্বনাশ কইরা দিবো। আর আইলেই-বা কি নিবো। আছেই-বা কি। আমেনা শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছে। ওর মনটা ভালো নেই।
একমাত্র মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি পাচ্ছে না সে। বড় একা একা লাগছে। কে জানে স্বামীর বাড়ি গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করছে হীরন।
আজ সকাল থেকে মরাকান্না জুড়েছে ফকিরের মা। মৃত ছেলেটার কথা মনে পড়েছে ওর। বেঁচে থাকলে হয়তো সে এখন বিয়ের বয়সী হতো।
জ্বর নিয়েও বুড়ো মকবুল পুকুর পাড়ে বসে মরিচের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। ফাতেমা দুবার এসে ডেকে গেছে ওকে, আপনের কি অইছে। এই রকম কাজ কইরলে তো দুই দিনে মরবেন আপনে।
কথাটা কানে নেয়নি মকবুল। একমনে পানি ঢালছে সে।
মন্তুকে পাঠিয়েছে গাঁয়ের কোবরেজ মশায়ের কাছে। লক্ষণ বলে ওষুধ নিয়ে আসার জন্য।
উঠোনে টুনিকে ডেকে তার হাতে ওষুধগুলো দিয়ে মন্তু বলল, কবিরাজ মশায় কইছে, এইগুলান ঠিকমত খাইতে।
টুনি ওষুধগুলো হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, কি অইবো ওষুধ খাইয়া, বুড়া মরুক। বলেই চারপাশে তাকাল টুনি, কেউ শুনল নাকি দেখল। মন্তু কোনো জবাব দিল না ওর কথায়। বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো হুঁকো আর কল্কেটা নিয়ে রসুই ঘরের দিকে চলে গেল সে। একটু পরে এক বাটি তেঁতুল মরিচ মেখে এনে মন্তুর সামনে বসল টুনি।
অল্প একটু তেঁতুল মুখে পুরে দিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে টুনি শুধাল, খাইবা ?
বাটিটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে মন্তু বলল, না। তারপর একমনে হুঁকো টানতে লাগল সে।
টুনি বলল, কবিরাজ কি কইছে ?
একরাশ ধুঁয়া ছেড়ে মন্তু জবাব দিল, কইছে, কিছু না, ভালো অইয়া যাইব।
ভালো অইয়া যাইবো ? চোখজোড়া কপালে তুলল টুনি।
নেড়ি কুকুরটা টুনিকে কিছু খেতে দেখে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। হঠাৎ দাওয়া থেকে পিঁড়ি তুলে ওর গায়ে ছুড়ে মারল টুনি।
সারাদিন কেবল পিছে পিছে ঘুরে, কোনহানে গিয়া একটু শান্তি নাই।
পিঁড়ির আঘাতে ঘেউ ঘেউ করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল কুকুরটা।

।। নয় ।।

চৈত্র মাসের রোদে মাঠটা খা খা করছে।
যেদিকে তাকান যায় শুধু শুকনো মাটি। পাথরের চেয়েও শক্ত। আর অসংখ্য ফাটল। মাটি উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। দাঁড়কাকগুলো তৃষ্ণায় সারাক্ষণ কা-কা করে উড়ে বেড়ায় এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে। বাড়ির আনাচে কানাচে। নদী নালাগুলোতে পানি থাকে না। মানুষ গরু ইচ্ছেমত পায়ে হেঁটে এপার-ওপার চলে যায়। পুকুরগুলোতে পানিও অনেক কমে আসে।
গরমে ঘরে থাকে না কেউ। গাছের নিচে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে দিন কাটায়। বাতাসে একটি পাতাও নড়ে না। সারাক্ষণ সবাই শুধু হা-হুতাশ করে। এমনি সময়ে হীরনকে দেখবার জন্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে গেছে বুড়ো মকবুল। যাবার সময় একটা ন্যাকড়ার মধ্যে এককুড়ি মুরগির ডিম সঙ্গে নিয়ে গেছে সে। শূন্য হাতে বেয়াই বাড়ি গেলে হয়তো ওরা লজ্জা দিতে পারে তাই। পথে বামুন বাড়ির হাট থেকে চার আনার বাতাসাও কিনেছে সে। বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবে।
ভর সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এল মকবুল। বার বাড়ি থেকে ওর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুরত ! সুরত ! ও মন্তু, কেউ কি নাই নাকি রে।
মন্তু গেছে মিয়া বাড়ি। গাছ কাটার চুক্তি নিয়েছে সে।

সুরতও সেখানে।
আবুল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি ভাই সাব, কি অইছে ?
টুনি আর আমেনাও বেরিয়ে এল বাইরে।
মকবুল বলল, সুরত, রশীদ ওরা কই ?
আমেনা বলল, সুরত কাজে গেছে, রশীদ গেছে হাটে, সালেহার লাইগা সাবু আনতে।
ওর জ্বর হইছে ভীষণ।
জ্বর নাহি, আহা কখন আইলো ? গায়ের ফতুয়াটা খুলতে খুলতে মকবুল বলল, বাপু তোমরা সক্কলে একটু সাবধানে থাইকো ! ও বিন্তির, বঁইচির মা শোনো, তোমরা একটু সাবধানে থাইকো।
গেরামে ওলা বিবি আইছে।
ইয়া আল্লা মাপ কইরা দাও ! আতঙ্কে সবাই শিউরে উঠল।
গনু মোল্লা ওজু করছিল, সেখান থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করল, কোন্‌হানে আইছে ওলা বিবি ? কোন্ বাড়িতে আইছে ?
মকবুল বলল মাঝি-বাড়ি।
মাঝি-বাড়ি ? এক সঙ্গে বলে উঠল সবাই। কয়জন পড়ছে ?
তিনজন।
তিনজন কে কে সে কথা বলতে পারবে না মকবুল, পথে আসার সময় ও বাড়ির আম্বিয়ার কাছ থেকে শুনে এসেছে সে।
বাড়ির সবাইকে আরেক প্রস্ত সাবধান করে দিল বুড়ো মকবুল, তোমরা সক্কলে একডু হুঁইসারে থাইকো বাপু। একডু দোয়া দরুদ পইড়ো। বলে খড়মটা তুলে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেল সে।
ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ নীরবে শুনছিল সব, এবার বিড়বিড় করে বলল, বড় খারাপ দিন-কাল আইছে বাপু। যেই বাড়িডার দিকে একবার নজর পড়ে সেই বাড়িডার এক্কেবারে শেষ কইরা ছাড়ে ওলা বিবি। বড় খারাপ দিন-কাল আইছে। বলে নিজের মৃত ছেলেটার জন্য কাঁদতে শুরু করল সে।
টুনি দাঁত মুখ শক্ত করে তেড়ে এল ওর দিকে, বুড়ি যহন তহন কান্দিছ না কইলাম। শিগ্‌গির থাম।
ধমক খেয়ে ফকিরের মা চুপ করে গেল। সেই বিয়ের সময় সালেহাকে মারার পর থেকে টুনিকে ভীষণ ভয় করে বুড়ি।
ইতোমধ্যে মন্তু আর সুরত ফিরে এসেছে।
কাঁধের ওপর থেকে কুড়ালটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে না রাখতে টুনি একপাশে টেনে নিয়ে গেল ওকে।
মাঝি-বাড়ি যাও নাই তো ?
মন্তু ঘাড় নাড়ল, না ক্যান কি অইছে ?
টুনি বলল, ওলা বিবি আইছে ওইহানে। বলতে গিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেল ওর।
মন্তুর দুচোখে বিস্ময়। বলল কার কাছ থাইকা শুনছ ?
ও কথার কোনো জবাব না দিয়ে টুনি আবার বলল, শোন, ওই বাড়ির দিকে গেলে কিন্তুক আমার মাথা খাও।
যাইও না ক্যান ?
মন্তু সায় দিয়ে মাথা নাড়ল কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারল না সে। আজ সকালে মিয়া-বাড়ি যাওয়ার পথে একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে গেছে মন্তু। নৌকাটাকে ভালোভাবে মেরামত করার বিষয় অনেকক্ষণ আলাপ করে গেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন তো এমন কিছু শুনেনি সে।
আম্বিয়ার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, সেও কিছু বলেনি।
উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবল মন্তু। বুড়ো মকবুলকে তামাক সাজিয়ে দেবার জন্যে রসুই ঘরে গেছে টুনি। এই সুযোগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।
দিঘির পাড়ে নন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের সঙ্গে দেখা হল। পরনে লুঙ্গি আর কুর্তা। হাতে লাঠি। বগলে একজোড়া পুরনো জুতো। মন্তুকে দেখে প্রসন্ন হাসির সঙ্গে তোরাব প্রশ্ন করল, কি মিয়া খবর সব ভালো তো ? মন্তু নীরবে ঘাড় নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কই যাও, শ্বশুর বাড়ি বুঝি ?
হুঁ, তোরাব শ্বশুর বাড়িতেই যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে অনেক দিন আসতে পারেনি, খোঁজ-খবর নিতে পারেনি। তাই সুযোগ পেয়ে একবার সকলকে দেখে যেতে এসেছে সে।

পকেট থেকে দুটি বিড়ি বের করে একটা মন্তুকে দিয়ে আরেকটা নিজে ধরাল সে। বিড়ি খেতে ইচ্ছা করছিল না ওর। তবু নিতে হল। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে থামল তোরাব। জুতো জোড়া বগল থেকে নামিয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্যে ঘাটে নেমে গেল সে।

বলল, একটুহানি দাঁড়ান মিয়া। অজু কইরা নি।

হাত-পা ধুয়ে জুতোজোড়া পরে আবার ওপরে উঠে এল তোরাব।

পকেট থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে বলল, মাঝি-বাড়ির খবর জানেন নাহি, সক্কলে ভালো আছে তো ?

মন্তু বলল, ভালো তো আছিল, কিন্তুক একটু আগে শুনছি, ওলা লাগছে।

ওলা ? তোরাব যেন আঁতকে উঠল। পায়ের গতিটা কমিয়ে এনে সে শুধাল, কার কার লাগছে ?

মন্তু বলল, কি জানি ঠিক কইবার পারলাম না।

হুঁ। হঠাৎ থেমে গেল তোরাব। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর পায়ের জুতোজোড়া খুলে আবার বগলে নিতে নিতে বলল, এই দুঃখের দিনে গিয়া ওনাগোরে কষ্ট দেয়নের কোনো মানি অয় না মিয়া, যাই, ফিইরা যাই। যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। আস্তে করে বলল, আমি যে আইছিলাম এই কথাডা কেউরে কইয়েন না মিয়া। বলে মন্তুর উত্তরের অপেক্ষা না করে যে পথে এসেছিল সে পথে দ্রুতপায়ে আবার ফিরে চলল তোরাব। হাতের বিড়িটা অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মন্তু।

মাঝি-বাড়ি থেকে একটা করুণ বিলাপের সুর ভেসে এল সেই মুহূর্তে। একজন বুঝি মারা গেল। কলজেটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল মন্তুর। মাঝি বাড়ির দেউড়িটা পেরিয়ে ভেতরে আসতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। নন্তু শেখ মারা গেল। হাঁপানি জর্জর করিম শেখ মৃত বাবার দেহের পাশে বসে কাঁদছে। আম্বিয়া কাঁদছে তার বিছানায় শুয়ে। ওলা বিবি তাকেও ভর করেছে। তাই বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা। সেখান থেকে কাঁদছে সে।

দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে রইল মন্তু।

মাঝি-বাড়ির ছমির শেখ ওকে দেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল। এই কি মুছিবত আইলো মিয়া, আমরা বুঝি এইবার শেষ অইয়া যামু। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল মন্তু। তারপর ওর কাছ থেকে বাকি খোঁজ-খবর নিলো সে। ছোট ভাই জমির শেখ কবিরাজ আনতে গেছে দুক্রোশ দূরে রতনপুরের হাটে। এখনো ফিরে আসেনি, ভোরের আগে যে আসবে তারও কোনো সম্ভাবনা নাই। এই একটু আগে ছমির শেখ, পরিবারের ছেলেমেয়ে সবাইকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বুড়োরা মরে গেলেও ছেলেমেয়েগুলো যাতে বাঁচে। নইলে বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না। ছমির শেখের দুগণ্ড বেয়ে পানি ঝরছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের চোখজোড়াও ভিজে এল ওর। আম্বিয়ার ঘরের দিকে তাকাতে দেখল, বিছানায় শুয়ে বিলাপ করছে মেয়েটা।

পরদিন ভোরে একটা খন্তা আর কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মন্তু।

পরীর দিঘির পাড়ে জায়গাটা আগেই দেখিয়ে গেছে জমির শেখ। কথা ছিল একটা কবর খোঁড়ার। এখন দুটা খুঁড়তে হবে। একটা নন্তু শেখের জন্যে আরেকটা জমির শেখের জন্যে। রাতে কবিরাজ আনতে যাওয়ার সময় ভেদবমি শুরু হয় ওর। বাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে মারা গেছে ও।

আগে মরার জন্যে কবর খোঁড়ার কাজটা নন্তু শেখ করতো। গত ত্রিশ বছর ধরে এ গাঁয়ে যত লোক মরেছে সবার জন্যে কবর খুঁড়েছে সে। কোদাল হাতে কবর খোঁড়ার সময় প্রায়ই একটা গান গাইতো নন্তু শেখ। আজ ওর কবরের ছক কাটতে গিয়ে সে গানটার কথা মনে পড়ে গেল মন্তুর।

এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।
মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

মাটি খুঁড়তো আর টেনে টেনে গান গাইতো নন্তু শেখ। বলত, কত মানুষেরে কবর দিলাম, কত কবর খুঁইড়লাম এই জীবনে। তার হিসাব কি আর আছে মিয়া। এমনও দিন গ্যাছে যহন, একদিন সাত আটটা কইরা মাটি দিছি।

গোরস্তানে কার কোন্‌টা কবর, কাকে কোনদিন এবং কোথায় কবর দিয়েছে, সব কিছু মুখে মুখে বলে দিতে পারতো নন্তু। আর যখন কবর খুঁড়তে গিয়ে মানুষের অস্থি কিংবা মাথার খুলি পেতো সে, তখন সবাইকে দেখিয়ে বিজ্ঞের মতো বলত, চিনবার পার এরে ? না না, তোমরা চিনবা কেমন কইরা। আমি চিনি। এইডা কলিমুল্লা মাঝির মাইয়ার খুলি।

এইহানেই তো কবর দিছিলাম ওরে। আহা মাইয়া আছিল বটে একডি। যেন টিয়া পাখির ছাও। যে একবার দেইখছে সেই আর ভুলবার পারে নাই। বলে খুলিটার দিকে খুব ভালো করে তাকাত নন্তু শেখ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার করে দেখত ওটা, আহা কি মাইয়া কি অইয়া গেছে। সোনার চাঁদ সুরত এখন চিনবারই পারা যায় না। অতি দুঃখের সঙ্গে নন্তু আবার বলত, গলায় ফাঁস দিয়া মইরছিল অভাগী। জামাইর সঙ্গে বনিবনা অইতো না, তাই। খুলিটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নন্তু বলে যেতো, সেই, বহুত দিনের কথা মিয়া, তহন তোমরা সব মায়ের পেটে আছিলা। সেই নন্তু শেখের মৃতদেহটা কবরে নামাতে গিয়ে চোখজোড়া পানিতে ঝাপসা হয়ে এল মন্তুর। মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে অইবো কবরে। সারাদিন আর বাড়ি ফিরলো না মন্তু। দিঘির পাড়ে কাটিয়ে দিল সে। ওর মায়ের কবরটা দেখল। এককালে বেশ উঁচু ছিল ওটা। অনেক দূর থেকে চোখে পড়তো, এখন মাটির নিচে খাঁদ হয়ে গেছে এক হাঁটু। অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত নেমে গেছে ভেতরের দিকে, সেখানে মায়ের দুএকখানা হাড় হয়ত আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। মায়ের জন্যে আজ হঠাৎ ভীষণ কান্না পেল ওর। মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই।

শুকনো পাতার শব্দে পেছনে ফিরে তাকাল মন্তু। টুনি দাঁড়িয়ে পেছনে। সারাদিন ওর দেখা না পেয়ে অনেক খোঁজের পর এখানে এসেছে সে। মন্তুকে ওর মায়ের কবরের পাশে বসে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল টুনি।

তারপর ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে আস্তে করে বলল, ঘরে যাইবা চল। কোনো কথা না বলে নীরবে উঠে দাঁড়াল মন্তু। কিন্তু তক্ষুণি বাড়ি ফিরল না সে।

বলল, তুমি যাও আমি আহি।

টুনি উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, কই যাইবা ?

মন্তু বলল, যাও না আইতাছি। বলে টুনিকে সঙ্গে নিয়ে পরীর দিঘির পাড় থেকে নেমে এল সে।

ও যখন বাড়ি ফিরে এল তখন বেশ রাত হয়েছে। বার বাড়ি থেকে মন্তু শুনতে পেল গনু মোল্লা ওরা বসে বসে কি যেন আলাপ করছে।

গনু মোল্লা বলছে, সব অইছে খোদার কুদরত বাপু। নইলে এই দিনে তো কোনোদিনই ওলা বিবিরে আইতে দেহি নাই।

মকবুল বলল, ওলা বিবির আর আজকাইল দিনকাল কিছু নাই। যহন তহন আহে।

আমেনা বলল, এক পা খোঁড়া বিবির। তবু যেন কেমন কইরা এত বাড়ি বাড়ি যায়, আল্লাহ মালুম।

ওর কথা শেষ না হতেই টুনি জিজ্ঞেস করল, কেমন কইরা ওর এক পা খোঁড়া অইল বুয়া ?

তখন টুনিকে বুঝাতে লেগে গেল আমেনা।

ওলা বিবি, বসন্ত বিবি আর যক্ষ্মা বিবি ওরা ছিল তিন বোন এক প্রাণ। যেখানে যেত একসঙ্গে যেতো ওরা। কাউকে ফেলে কেউ বেরুত না বাইরে।

একদিন যখন খুব সুন্দর করে সেজেগুজে ওরা রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল তখন হঠাৎ হযরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। রঙিন শাড়ি পরে বেরুলে কি হবে, ওদের চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না হযরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন ওরা একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষ্মা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কাণ্ড কইরা বইসলেন তিনি। খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেল ওলা বিবির। আহা সব খোদার কুদরত। মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, একখানা পা দিয়া দুনিয়াডারে জ্বালাইয়া খাইতাছে বেটি। দুই পা থাইকলে তো দুনিয়াডারে একদিনে শেষ কইরা ফালাইত।

হঠাৎ মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বুড়ো মকবুল মুহূর্তে রেগে গেল। কিরে নবাবের বেটা তোরে একশবার কই নাই, মাঝি-বাড়ি যাইস না, গেলি ক্যান অ্যাঁ ?

গনু মোল্লা বলল, আক্কেল পছন্দ নাই তোর।

সুরত আলী বলল, বাড়ির কারো যদি এহন কিছু অয় তাইলে কুড়াইল মাইরা কল্লা ফালাইয়া দিমু তোর।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বলল, বাপু গেলেই কি অইবো আর না গেলেই কি অইবো না, যার মউত আল্লায় যেই দিন লেইখা রাইখাছে সেই দিন অইবো। কেউ আটকাইবার পারব না।

ঠিক কইছেন চাচি, আপনে ঠিক কইছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওকে সর্মথন জানাল টুনি।

ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ফাতেমা জানাল, গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে একটা খোঁড়া কুকুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

বড় ভালা দেখছ বউ। বড় ভালা দেখছ। ফকিরের মা পরক্ষণে বলল, ওই খোঁড়া কুত্তা, খোঁড়া মোরগ আর গরুর সুরত ধইরাই তো আহে ওলা বিবি। এক গেরাম থাইকা অন্য গেরামে যায়। বলে সমর্থনের জন্যে সবার দিকে এক নজর তাকাল সে।

মকবুল জানাল, শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে খোঁড়া কাক, শিয়াল কিম্বা খোঁড়া মানুষের রূপ নিয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করেন ওলা বিবি।

হ্যাঁ মিয়ারা। বুড়ো মকবুল সবাইকে সাবধান করে দিল। খোঁড়া কিছুরে বাড়ির ধারে-কাছে আইতে দিয়ো না তোমরা। অচেনা কোনো খোঁড়া মানুষও না। দেখলেই ওইগুলারে তাড়ায়ে খাল পার কইরা দিও।

সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। হ্যাঁ তাই করবে।

রাতে ঘুম হল না মন্তুর।

সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করল সে।

পরীবানুর পুঁথির কথা মনে পড়ল মন্তুর। সুরত আলী মাঝে মাঝে সুর করে পড়ে ওটা।

কুলাটিয়া গ্রামের এক গৃহস্থের বউ পরীবানু। স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হত না। অষ্টপ্রহরে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। ঘর ছেড়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে নীরবে বসে থাকত সে। আর সেখান থেকে দেখত একটি রাখাল ছেলেকে। দূরে একটা বট গাছের নিচে বসে একমনে বাঁশি বাজাত সে। এমনি চোখের দেখায় প্রেম হয়ে গেল।

তারপর

তারপর একদিন সময় বুঝিয়া।

দুইজনে পালায়া গেল চোখে ধুলা দিয়া।

মন্তুরও তাই মনে হল। টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে, বহুদূরে, দূরের কোনো গ্রামে কিম্বা শহরে। না শান্তির হাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে তাহলে মনোয়ার হাজি নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মন্তু। যে-কোনো দোকানে হাজিকে দিয়ে একটা চাকুরী জুটিয়ে নেবে সে। এমনি আরো অনেক চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুতেই আমেনা জিজ্ঞেস করল, নন্তু শেখের বাড়ির কোনো খবর জান ?

না।

ওমা জান না ? নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখ পড়েছে আজ।

মন্তু কোনো কথা বলল না।

আমেনা বলে চলল, কবিরাজে কিছু কইরবার পারল না। তাই তো গনু মোল্লারে ডাইকা নিছে। একটু ঝাড়ফুঁক দিয়া যদি কিছু অয়।

মন্তুকে চুপ করে থাকতে দেখে আমেনাও চুপ করে গেল।

অবশেষে আরও আট দশটি প্রাণ হরণ করে তবে গ্রাম থেকে বিদায় নিলেন ওলা বিবি। গ্রামের সবাই মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ পড়ালো বাড়ি বাড়ি।

ওলা বিবি গেলেন। আর দিন কয়েক পরে বৃষ্টি এল জোরে। আকাশ কালো করে নেমে এল অবিরাম বর্ষণ। সারা রাত মেঘ গর্জন করল। বাতাস বইলো আর প্রচণ্ড বেগে ঝড় হল।

আগের দিন বিকেলে আকাশে মেঘ দেখে বুড়ো মকবুল তার পুরনো লাঙলটা ঠিক করে নিয়েছে। গরু নেই ওর। রওশন ব্যাপারির কাছ থেকে একজোড়া গরু ঠিকে নিবে। যে কদিন হাল চলবে সে কটা দিনের জন্যে নগদ টাকা দিতে হবে। তাছাড়া গরুর ঘাস-বিচালির পয়সাটাও জুটাতে হবে তাকে।

ভোর না হতেই সবাই বেরিয়ে পড়ল মাঠে।

আবুল, মন্তু, সুরত আলী, রশীদ, বুড়ো মকবুল আর গ্রামের সবাই।

পুরষেরা কেউ বাড়ি নাই।

পুরো মাঠজুড়ে হাল পড়েছে। পাথরের মত শক্ত মাটি বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে নরম হয়ে গেছে।
হট হট হট, হুঁ উঁ উঁ।
বড় মিয়ার জমিতে লাঙল নামিয়েছে মন্তু আর সুরত।
এককালে এ জমিটা সুরত আলীর ছিল। সরেস জমি। প্রায় মণ সাতেক ধান ফলত তখন। ধানের ভারে গাছগুলো সব নুয়ে পড়ে থাকত মাটিতে।
নিজ হাতে ক্ষেতে লাঙল দিত সুরত। মই দিত। ধান ফেলত খুব সাবধানে। গাছ উঠলে, বসে বসে আগাছাগুলো পরিষ্কার করত।
ছাই আর গোবর ছড়িয়ে দিয়ে যেতো প্রতিটি অঙ্কুরের গোড়ায়। তারপর খাজনার টাকা জোটাতে না পেরে ওটা বড় মিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে।
আহা জমিডার কি অবস্থা কইরাছে দেখছস ? লাঙল ঠেলতে ঠেলতে সুরত আলী বলল, জমির লাইগা ওগো আধ পয়সার দরদ নাই। দরদ নাই দেইখাই তো জমিনও ফাঁকি দিবার লাগছে।
মন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, গেল বছর মোটে দেড় মণ ধান পাইছে।
কোথায় সাত মণ আর কোথায় দেড় মণ।
বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠল সুরত আলীর। রুগ্ন গরু দুইটাকে হট হট করে জোরে তাড়া দিয়ে বলল, জমির খেদমত করন লাগে। বুঝলা মন্তু মিয়া, জমির খেদমত করন লাগে। যত খেদমত কইরবা তত ধান দিব তোমারে।
শেষের কথাগুলো স্পষ্ট করে শোনা যায় না। আপন মনে বিড়বিড় করে সুরত। হঠাৎ কোনখানে যদি কতগুলো টাকা পেয়ে যেত তাহলে জমিটাকে আবার কিনে নিত সে। তখন সাত মণের জায়গায় আট মণ ধান বের করত সে এ জমি থেকে।
আকাশে এখনও অনেক মেঘ, দক্ষিণের বাতাসে উত্তরে ভেসে যাচ্ছে ওরা। যেকোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে নিচে। সুরত তখনো বলে চলছে আপন মনে। খোদার ইচ্ছা অইলো, জমিনগুলান আমার থাইকা কাইড়া নিলো। খোদার ইচ্ছা অইলো জমিনগুলান বড় মিয়ারে দিয়া দিলো। জমির লাইগা যার একটুও মায়াদয়া নাই তারেই দিল খোদা দুনিয়ার সকল জমি। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া ? ইনছাফ ইনছাফ করো মিয়া। এইডা কেমন তর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া ? হির্‌র্। হট হট। হুঁ উঁ উঁ। গরুগুলোর লেজ ধরে জোরে তাড়া দিল সুরত আলী।
অদূরে রশীদ তার জমিতে ধান ফেলছে। মিশকালো দেহ বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে ঘাম ঝরছে ওর। হাঁটার সময় মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে খেতের মধ্যে পড়ে যাবে সে। ওটাও বড় মিয়ার খেত। বর্গা নিয়ে চাষ করছে রশীদ। ওর পাশের খেতে মই জুড়েছে বুড়ো মকবুল। কাজ করার সময় আশেপাশের দুনিয়াকে একেবারে ভুলে যায় সে। কোথায় কি ঘটছে লক্ষ করে না। ধান ফেলা শেষ হলে, রশীদ ডাকলো অ-ভাইজান।
মকবুল মুখ না তুলেই জবাব দিল, কি, কও না।
ধান তো ফালায়া দিলাম আল্লার নাম নিয়া।
দাও, দাও, ফালায়া দাও। এহন যত তাড়াতাড়ি ফালাইবা তত লাভ।
আর লাভের কথা কইও না। গরুজোড়ার সঙ্গে মই জুড়তে জুড়তে রশীদ জবাব দিল। ধান বেশি অইলেইবা কি বড় মিয়াকে অর্ধেক দিয়া দেওন লাগব।
ওই দিয়া থুইয়া যা থাকে তাই লাভ। মকবুল সান্ত্বনা দিল ওকে।
সুরত আলী তখনও আপন মনে বলে চলেছে, পরের জমিতে কোনো আরাম নাই মন্তু মিয়া, পরের জমি, আরে গরুগুলোর আবার কি অইলো। হট, হট, হুঁ উঁ উঁ।
মন্তু ততক্ষণে গান ধরেছে।
হঠাৎ গান থামিয়ে গরুজোড়ার লেজ ধরে সজোরে টান দিল মন্তু।
ইতি, ইতি, ইতি, চল।
সুরত বলল, গান থামাইলি ক্যান মন্তু। গাইয়া যা, গাইয়া যা।

মন্তু বলল, না ভাইজান গলাডা হুকাইয়া গেছে, গান বাইরয় না।
হ, হ, দুনিয়াডাই হুকাইয়া গেছে মন্তু মিয়া। তোর গলা হুকায় নাই।
জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সুরত আলী। আমাগো জমানায় আহা, কত গান গাইছি, কত ফুর্তি কইরছি। আর অহন দুনিয়াডাই আরেক রকম হইয়া গেছে মন্তু মিয়া। গাজী কালুর দুনিয়া আর নাই। সোনাভানের দুনিয়া পুইড়া ছাই অইয়া গেছে। বলে কর্কশ গলায় সে নিজে একখানা গান ধরলো।

যা ছিল সব হারাইলাম হায় পোড়া কপাল দোষে।
ও খোদা,
আমার কপাল এমন তুমি কইরলা কোন দোষে।

গান গাইতে গাইতে খুক খুক করে অনেকক্ষণ কাশল সুরত। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলো। থাম থাম আরে থামরে নবাবের বেটা। থাম। গরুগুলোকে থামিয়ে তামাক খাওয়ার জন্যে আলের ধারে এসে বসল সে। বলল, মন্তু মিয়া, আহ তামুক খাইয়া লও। তামাকের গন্ধ পেয়ে মকবুল আর রশীদ ওরাও খেত ছেড়ে উঠে এল। জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বুড়ো মকবুলের দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল সুরত। প্রথমে এক নিঃশ্বাসে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো মকবুল। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মন্তু মিয়া তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আইজ। সইন্ধ্যা বেলা বাড়ি থাইকো।
রশীদ আর সুরত একবার হুঁকোর দিকে তাকাল, কিছু বলল না।
ওদের নজর এখন হুঁকোর দিকে।
সন্ধ্যে বেলা বুড়ো মকবুলের কাছ থেকে কথাটা শুনল মন্তু। ওর বিয়ের কথা।
মকবুল ঠিক করেছে এবার সত্যি সত্যি একটা বিয়ে করিয়ে দিবে মন্তুকে। চাচা-চাচি এতদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বিয়ে দিয়ে দিতেন।
চাচা নেই। মকবুল বেঁচে আছে। বাড়ির মুরব্বি সে। এ ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব রয়েছে।
পাত্রী ঠিক করে নিয়েছে মকবুল। মাঝি-বাড়ির আম্বিয়া।
নন্তু শেখ আর তার ছেলে করিম শেখ কলেরায় মারা যাবার পর আম্বিয়া একা। বসত বাড়িটা, বাড়ির ওপরের ছোট খেতটা আর সে নৌকাটার এখন মালিক সে।
ওকে বিয়ে করলে মন্তু অনেকগুলো সম্পত্তি পেয়ে যাবে একসঙ্গে।
রশীদ তার ঘরের চালায় খড় দিয়ে ফুটোগুলো মেরামত করছিল।
তাকে ডাকল মকবুল। তোমরা এইটার একটা ফয়সালা কইরা ফালাও মিয়া। ওই মাইয়া বেশিদিন থাকবো না। বহু লোকের চোখ পইড়াছে।
ওপর থেকে রশীদ বলল, মাইয়ার হাঁপানি, শেষে বাড়ির সক্কলের হাঁপানি অইবো।
মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আরে একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক। পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয় তো তালাক দিয়া দিব। মন্তু সহসা কিছু বলল না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আম্বিয়াকে অনেক ভালো লাগছিল তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলত, তাহলে তক্ষুণি রাজি হয়ে যেত সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্তু।
বুড়ো মকবুল বলল, অমন সম্বন্ধ আর পাইবি না মন্তু। চিন্তা করার কিছু নাই। মত দিয়া দে। কাইল রাইতে গিয়া ওর চাচা ছমির শেখের সঙ্গে আলাপ কইরা আহি।
ফকিরের মা বলল, আপনেরা মুরুব্বি, আপনেরা ঠিক কইরা ফালান।
আমেনা বলল, ঠিক কথা কইছ চাচি।
মন্তু তখনও ভাবছে।
একটা বসতবাড়ি। একটা নৌকো। আর বাড়ির ওপরে এক টুকরো খেত। দেখতেও সুন্দরী সে।
বুড়ো মকবুল বলল, তাইলে ওই কথাই রইল। কাইল রাইতের বেলা ওর চাচার সঙ্গে আলাপ করি গিয়া।
মন্তু চুপ করে রইল, তারপর খুব আস্তে করে বলল ও, আপনেরা যেইডা ভালা মনে করেন, করেন।

মুখ তুলে তাকাতে পারলো না সে। রসুই ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে টুনি। দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটছে সে।
মন্তুর কথা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠল সে। বলল, আমাগো মন্তু মিয়ার বিয়ায় কিন্তুক বড় দেইখ্যা একখানা পালকি আনন লাগব।
বিয়ের কথা শুনে সুরত আলী আর আবুলও সমর্থন জানালো। গনু মোল্লা বলল, ভালা অইছে। মন্তু এইবার সংসারী অইবো।
রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টুনি মকবুলকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার একডা কথা আছে।
মকবুল রেগে উঠল। এই রাতের বেলা এখন ঘুমাতে যাবে। এই সময়ে আবার এমন কি কথা বলতে চায় টুনি।
রেগে বলল, কাইল দিনের বেলা কইয়ো।
টুনি বলল, না অহনি লাগব।
বুড়ো মকবুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, আচ্ছা কও কি কথা।
চারপাশে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে কথাটা বলল টুনি। মকবুল বড় বোকা। নইলে এমন সুযোগটা কেন হেলায় হারাচ্ছে সে। একটা বসত বাড়ি। একটা খেত। আর একটা নৌকো। ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক সেও হতে পারে। সে কেন বিয়ে করে না আম্বিয়াকে। বুড়ো মকবুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এ সম্ভাবনার কথা সে নিজেও ভাবেনি এর আগে। টুনি যা বলল, শুধু তাই নয় আরো লাভ আছে আম্বিয়াকে বিয়ে করায়। সারাদিন একটানা ধান ভানতে পারে সে। খাটতে পারে অসম্ভব।
ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বলল, চিন্তা কইরতাছেন কি, চিন্তা করার কিছুই নাই।
এ মুহূর্তে টুনিকে ওর নিজের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হল মকবুলের। মনে হল টুনির কাছে নেহাত একটা শিশু সে।
একটু পরে চাপা গলায় মকবুল বলল, বড় বউ আর মাইঝা বউ যদি রাজি না হয় ?
টুনি বলল, রাজি অইব না ক্যান। নিশ্চয় অইবো।
মকবুল বলল, ওগো না অয় রাজি করন গেল। কিন্তু আম্বিয়া ?
মকবুলের কণ্ঠস্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা।
টুনি বলল, চেষ্টা কইরলে সব অয়, অইব না ক্যান ?
এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ওরা। মকবুল বলল, বহ বউ। বহ।
টুনি বসল ওর পাশে। দু'জনে পাশাপাশি। মকবুলের কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখল টুনি। তারপর নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইল ওরা। বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের উঠোনে বসিয়ে কিচ্ছা বলছে ফকিরের মা। চাঁদ সওদাগরের কিচ্ছা। এক মনে হা করে শুনছে সবাই।
সালেহা কাঁদছে ওর ঘরে। কাল দুপুরে ওর মুরগিটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে ধরে। সেই শোকে কাঁদছে সে।
আমেনা আর ফাতেমা দু'জনকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে কথাটা বলল বুড়ো মকবুল।
শুনে আমেনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, এমন কি অভাব আছে আপনের যে ওকে বিয়ে করতে চান ?
ফাতেমা বলল, এই বুড়ো বয়সে মাইনষে কইবো কি ?
টুনি বলল, মাইনষের কথা হুইনা কি অইবো। মাইনষে তো অনেক কথা কয়। তবু ফাতেমা আর আমেনা ঘোর আপত্তি জানাল। মকবুল অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল ওদের। কিন্তু ওরা রাজি হল না।
অবশেষে মকবুল রেগে গেল। শাসিয়ে বলল, অত কথা বুঝি না। আম্বিয়ারে বিয়া আমি করমুই। তোমরা পছন্দ কর কি না কর।
কথাটা চাপা থাকল না।
পরদিন বাড়ির সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা।
মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে মকবুল।
কথাটা আমেনা আর ফাতেমার কাছ থেকে শুনেছে সবাই।
মন্তু রীতিমতো অবাক হল।

সালেহা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, ইতা কেমন কথা অ্যাঁ। মাইনষে হুনলে কইবো কি ?

ফকিরের মা বলল, মকবুল মিয়ার এইডা উচিত অয় নাই। যাই কও মিয়া, এইডা উচিত অয় নাই।

আমেনা আর ফাতেমা দুজনে মিলে গনু মোল্লার কাছে কাঁদাকাটি করেছে। বলেছে, মাইনষে হাসাহাসি কইরবো। আপনে ওনারে বাধা দ্যান। আপনের কথা উনি হুনবেন। সুরত আর আবুলকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ করল গনু মোল্লা। বলল, বাড়ির বদনাম অইয়া যাইব।

শুনে সুরত আলী আর আবুল দুজনে ক্ষেপে উঠল। এইসব কি অ্যাঁ, বুড়ার কি ভীমরতি অইছে নাহি ?

আবুল বলল, বুড়ো বয়সে এইসব কি পাগলামি শুরু অইছে।

কিছু বলল না শুধু মন্তু।

রাতে গনু মোল্লার ঘরে জমায়েত হল সবাই।

রশীদ এল। আবুল এল। সুরত আলী, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, ফকিরের মা সবাই এল।

এল না শুধু মন্তু, টুনি, আর যাকে নিয়ে বসা সেই বুড়ো মকবুল।

মকবুল তার ঘরের মধ্যে নীরবে বসে রইল।

সব কিছু সেও শুনেছে।

গনু মোল্লার ঘরে ওরা কেন জমায়েত হয়েছে সব বুঝতে পেরেছে সে।

এর মূলে আমেনা আর ফাতেমা। ওর দুই স্ত্রী। যাদের এতদিন খাইয়েছে পরিয়েছে সে। নিমকহারাম, এক নম্বরের নিমকহারাম। চাপা আক্রোশে গর্জাতে লাগল বুড়ো মকবুল। টুনি বলল, ওগো হিংসা অইতাছে। ওরা চায় না আপনে সম্পত্তির মালিক অন।

টুনি ঠিক বলেছে, বাড়ির কেউ চায় না ও আম্বিয়াকে বিয়ে করুক।

বিয়ে করলে একদিনে অনেকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বুড়ো মকবুল। বাড়ির কেউ সেটা সহ্য করতে পারছে না।

এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে ওর হাতে তুলে দিল টুনি। বলল, মাথা গরম কইরেন না। এই সময় মাথা ঠান্ডা রাখন লাগে।

গনু মোল্লার ঘরে সবাই জমায়েত হলেও মকবুলকে সেখানে ডেকে আনার জন্যে যেতে কেউ সাহস করল না।

আবুল বলল, সুরতকে যেতে।

সুরত বলল, ফকিরের মার কথা। ফকিরের মা ভয়ে আঁতকে উঠে বলল, ওরে বাবা আমি যাইবার পারমু না।

অবশেষে গনু মোল্লাকে আসতে হল।

উঠান থেকে মকবুলের নাম ধরে ডাকলো সে।

মকবুল বেরুলো না। বেরিয়ে এল টুনি।

একটু পরে ভেতরে এসে টুনি বলল আপনারে যাইতে কয়।

গনু মোল্লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুড়ো মকবুল বলল, ক্যান, ক্যান যাইতে কয়।

টুনি বলল, কি কথা আছে।

মকবুল বলল, কথা এখানে আইসা কইতে পারে না। আমি যামু ক্যান ? টুনি ওকে শান্ত করল। বলল, মাথা গরম কইরেন না, যান না ওরা কি কয় শুনেন গিয়া।

স্ত্রীর মুখের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকাল বুড়ো মকবুল।

তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে।

বুড়ো মকবুলকে গনু মোল্লার ঘরে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসল সবাই।

কারো মুখে কথা নেই।

টুনি এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো মকবুলের পাশে।

গনু মোল্লা তার নামাজের চৌকিটার ওপরে বসল।

সবাই চুপ।

কেউ কিছু বলছে না।

কথাটা কি দিয়ে যে শুরু করবে ভেবে উঠতে পারছে না কেউ।

টুনিই প্রথম কথা বলল, কই আপনেরা কিছু কইতেছেন না ক্যান। ক্যান ডাকছেন, কন না।

সুরত আলী নড়েচড়ে বসল।

আমেনা নীরব।

ফাতেমা মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গনু মোল্লা বলল, মন্তুর বিয়ার ব্যাপারটা কি অইছে। কথাটা বলে মকবুলের দিকে তাকাল সে।

বুড়ো মকবুল কোনো জবাব দেবার আগেই টুনি বলল, মন্তু কইছে ও আম্বিয়ারে বিয়া করবো না।

ওর কথা শুনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল সবাই।

ফকিরের মা বলল, কই মন্তু মিয়া কই, তারে ডাহ না।

কিন্তু মন্তুকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে। টুনি বলল, ডাহন লাগবো না ওরে, ও আমারে কইছে বিয়া কইরবো না।

আবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তাইলে আমি বিয়া করুম আম্বিয়ারে।

আমার ঘরে বউ নাই খানাপিনার অসুবিধা অয়।

ওর কথা সম্পূর্ণ না হতেই আমেনা আর ফাতেমা একসঙ্গে বলে উঠল, হু তোমার একটা বউ দরকার।

বুড়ো মকবুল টুনির দিকে তাকাল।

টুনি বলল, ক্যান, ধইরা ধইরা মাইরা কবরে পাঠাইবার লাইগা নাহি।

আবুল রেগে উঠল, আমার বউ যদি আমি মারি তোমার তাতে কি ?

চুপ কর বেয়াদব, হঠাৎ গর্জে উঠল মকবুল। এই জিন্দেগিতে আর তোরে বিয়া করামু না আমরা। তিন তিনটা মাইয়ারে তুই কবরে পাঠাইছস। আবার বিয়ার নাম করছে, শরমও লাগে না। একটুখানি দম নিয়ে বুড়ো পরক্ষণে বলল, আম্বিয়ারে আমি বিয়া করমু ঠিক করছি। বলে টুনির দিকে তাকাল সে।

আমেনা আর ফাতেমা পরমুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, আপনেরা শুনছেন, শুনছেন আপনেরা ইতা কিতা কইবার লাগছে উনি।

যা কইছি ঠিক কইছি। আঙুল তুলে ওদের দুইজনকে শাসাল মকবুল। তোমাগো যদি ভালো না লাগে তোমরা বাড়ি ছাইড়া চইলা যাও।

শুনছেন শুনছেন আপনেরা। কি কয় শুনছেন। আমেনা কেঁদে ফেলল। গনু মোল্লা বলল, এইডা ঠিক অইলো না মকবুল মিয়া। এইডা কোনো কামের কথা অইলো না। এই বুড়ো বয়সে আরেকডা বিয়া কইরলে মাইনষে কি কইবো।

সুরত আলী আর ফকিরের মা বলল, মাইনষে বাড়ির বদনাম করবো।

আমেনা বলল, মাইয়া বিয়া দিছে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছি ছি কইরবো না।

কটমট চোখে আমেনার দিকে তাকাল মকবুল।

ফাতেমা বলল, বুড়ো বয়সে ভূতে পাইছে।

'নিমকহারাম' বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল সে। ঘরের মাঝখানে, এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে এক সঙ্গে তালাক দিয়ে দিল সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইক্যা।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠল।

পরক্ষণে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আমেনা।

ফাতেমা মূর্ছা গেল।

ফকিরের মা চিৎকার করে উঠল, আহারে পোড়াকপাইল্যা, এই কি কইরলি তুই, ওরে পোড়াকপাইল্যারে এই কি কইরলি।

আবুল হঠাৎ বসার পিঁড়িটা হাতে তুলে নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারল মকবুলের কপাল লক্ষ্য করে। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ অ্যাঁ। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ, বেআক্কেইল্যা কোনহানের।

দুহাতে কপাল চেপে মাটিতে বসে পড়লো মকবুল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকির মতো রক্ত ঝরছে ওর।

কান্না, চিৎকার, গালাগালি আর হা-হুতাশে সমস্ত ঘরটা মুহূর্তে নরকের রূপ নিল।

মকবুলকে দু'হাতে কাছে টেনে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল টুনি।

ফাতেমার মাথায় পানি ঢালতে লাগল সালেহা।

ফকিরের মা আমেনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলল।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনল মন্তু। সব দেখল সে।

কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। নীরবে পরীর দিঘির দিকে চলে গেল সে।

পরদিন বিকেলে খবর পেয়ে আমেনা আর ফাতেমার বাড়ির লোক এসে নিয়ে গেল ওদের। যাবার সময় করুণ বিলাপে পুরো গ্রামটাকে সচকিত করে গেল ওরা। এতদিনের গড়ে তোলা সংসার এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঘরের পেছনে লাগানো লাউ কুমড়ার মাচাগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমেনা। যাবার সময় ফকিরের মাকে কেঁদে কেঁদে বলে গেল, হীরনকে খবরডা দিয়ো না। শুইনলে, মাইয়া আমার বুক ভাসাইয়া মইরা যাইব। খোদার কসম রইল, বুয়া, মাইয়ারে আমার খবরডা দিয়ো না।

ফাতেমাকে নেয়ার জন্য ভাই এসেছিল ওর। যাবার সময় বাড়ির সবাইকে শাসিয়ে গেছে ও। বলে গেছে শিকদার-বাড়ির লোকগুলোকে একহাত দেখে নেবে সে। বোনের জন্য চিন্তা করে না ও। আগামী তিন মাসের মধ্যে এর চেয়ে দশগুণ ভালো ঘর দেখে ফাতেমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

মকবুল বিছানায়। মাথায় ওর একটা পট্টি বেঁধে দিয়েছে টুনি। হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে বুড়োর। মাঝে দুএকবার চোখ মেলে তাকিয়েছিল। এখন নীরবে ঘুমুচ্ছে। টুনি পাশে বসে বাতাস করছে ওকে। রাতে গনু মোল্লা এল ওর ঘরে। বুড়ো মকবুলের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে ওর জ্বর আছে কি না দেখল। তারপর আস্তে কইরা বলল, রাগের মাথায় ইতা কিতা কইরলা মিয়া। শরীর ভালা অইয়া গেলে ভাবীসাবগোরো বাড়ি নিয়া আহ। রাগের মাথায় তালাক দিলে তো আর তালাক অয় না। ওই তালাক অয় নাই তোমার।

এক বাটি বার্লি হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল টুনি। ওকে আসতে দেখে গনু মোল্লা চুপ করে গেল।

টুনির ওপরে আক্রোশ পড়েছে সবার। সবাই বুঝতে পেরেছে, এই যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে এর জন্যে টুনিই দায়ী।

উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেকে অনেক কথা বলল। ওর নাম ধরে অনেক গালাগাল আর অভিশাপ দিল বাড়ির ছেলেমেয়েরা।

টুনি নির্বিকার। একটি কথারও জবাব দিল না।

দিন কয়েক পরে আম্বিয়ার চাচা ছমির শেখ জানিয়ে দিয়ে গেল, বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করবে না আম্বিয়া।

তাছাড়া খুব শীঘ্রই আম্বিয়ার বিয়ের সম্ভাবনাও নেই।

কথাটা শুনল বুড়ো মকবুল। শুনে কোনো ভাবান্তর হল না। ঘরের কড়ি-কাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

ইদানীং দিনরাত মকবুলের সেবা করছে টুনি। সারাক্ষণ সে ওর আশেপাশে থাকে। একটু অবকাশ পেলে রসুই ঘরে গিয়ে রান্নাবান্নার পাটটা সেরে আসে সে। মরিচ খেত আর লাউ কুমড়োর গাছগুলোর তদারক করে আসে। মাঝে মাঝে ফকিরের মা আর সালেহার আলাপ শুনে টুনি। মন্তু আর আম্বিয়াকে নিয়ে আলাপ করে ওরা। আজকাল নাকি অনেক রাত পর্যন্ত আম্বিয়াদের বাড়িতে থাকে মন্তু। টুনি শুনে। কিছুই বলে না। একদিন বিকেলে মন্তু যখন বাইরে বেরুবে তখন তার সামনে এসে দাঁড়াল টুনি। বলল, জ্বরডা ওর ভীষণ বাইড়া গেছে। কবিরাজের কাছ থাইকা একটু ওষুধ আইনা দিবা ?

ওর মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মন্তু। ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি। হঠাৎ বয়সটা যেন অনেক বেড়ে গেছে ওর। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চুলগুলো শুকনো।

মন্তু ইতস্তত করছিল।

টুনি আবার বলল, আজকা না হয় মাঝি-বাড়ি না গেলা। একটু ওষুধটা আইনা দাও।

ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো ম্লান হাসি।

মন্তু কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বলল, যাইবা না ক্যান, একশ বার যাইবা। ঘর থেকে বুড়ো মকবুলের ডাক শুনে আর সেখানে দাঁড়াল না টুনি। পরক্ষণে চলে গেল সে।

ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মন্তু। তারপর বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেল।

রাতে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল মন্তু। বর্ষা এগিয়ে আসছে। আম্বিয়া বলেছে, নৌকাটা ঠিক করে নেবার জন্যে। চাচা ছমির শেখ চেয়েছিল নৌকাটা নিজে বাইবে।

কিন্তু আম্বিয়া রাজি হয়নি। মন্তু ছাড়া অন্য কাউকে ওতে হাত দেবার অধিকার দিতে রাজি নয় সে।

ছমির শেখ রেগে গালাগাল দিয়েছে ওকে। মন্তু সম্পর্কে কতগুলো অশ্লীল মন্তব্য করে বলেছে, ওর সঙ্গে তোমার মিলামিশা কিন্তুক ভালো অইতাছে না আম্বিয়া। গেরামের লোকজনে পাঁচ রকম কথাবার্তা কইতাছে।

কউক। তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে আম্বিয়া।

ওর স্পষ্ট উত্তরে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছে ছমির শেখ। বলেছে, তোমার কিছু আহে না আহে, আমাগো আহে। মন্তুরে কিন্তুক এই বাড়িতে আইতে নিষেধ কইরা দিও বইলা দিলাম।

তবু বারবার মন্তুকে বাড়িতে ডেকেছে আম্বিয়া।

ও গেলে সংসারের নানা কথা নিয়ে আলাপ করেছে ওর সঙ্গে।

আজও মন্তুর জন্যে অপেক্ষা করছিল আম্বিয়া।

ও আসতে একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিল আম্বিয়া।

অর্ধেকটা মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সলজ্জ হাসির ঈষৎ আভাটা চোখে পড়েও যেন পড়তে চায় না।

আম্বিয়া বলল, এত দেরি অইলো ?

মন্তু বলল, কবিরাজের কাছে গিছলাম।

কেন গিয়েছিল তা নিয়ে আর প্রশ্ন করে না আম্বিয়া।

দূরে নিজ ঘরের দাওয়ায় বসে আড়চোখে বারবার এদিকে তাকায় ছমির শেখ আর বিড়বিড় করে কি যেন সব বলে।

রাতে ওখানে খেলো মন্তু।

পানটা মুখে পুরে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

বাইরে তখন ইলশেগুঁড়ি পড়ছে।

কদিন পর পর বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার ওপর দিয়ে পানি গড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। পানির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বেলে আর পুঁটি ছুটোছুটি করছিল এদিকে সেদিকে।

অন্ধকারের ভেতর মকু আর ছকু দু'ভাই মাছ ধরছিল বসে বসে।

মন্তুকে দেখে বলল, কি মিয়া এত রাইতে কোন্ দিক থাইক্যা ?

মাঝি-বাড়ি।

হুঁ। একটা পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু বলল, চইল্যা যাও ক্যান মন্তু মিয়া। তামুক খাইয়া যাও।

না মিয়া শরীরডা ভালা নাই।

মন্তু যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে ছকু বলল, আরে মিয়া যাইবা আর কি বও। কথা আছে।

কি কথা কও। জলদি কও। পায়ের পাতায় ভর করে মাটিতে বসল মন্তু।

নিঝুম রাত। শুধু একটানা জল গড়ানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দুএকটা ব্যাঙ ডাকছে এখানে ওখানে। আরো তিন চারটে পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু আস্তে বলল, কি মন্তু মিয়া তুমি নাহি করিমনের বইন আম্বিয়ারে বিয়া কইরতাছ হুনলাম। বলে অন্ধকারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসল সে।

তামাক খেতে খেতে ওর দিকে তাকাল মন্তু। কিছু বলল না।

কি মন্তু মিয়া চুপ কইরা রইলা যে ? ওকে কনুইয়ের একটা গুঁতো মারল ছকু। বিয়া শাদি করবার আগে আমাগোরে একটু জানাইয়ো, একটু দাওয়াত টাওয়াত কইরো।

করমু। করমু। আগে বিয়া ঠিক হোক তারপর করমু। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে।

দাওয়ার পাশে টুনি দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে হঠাৎ চেনা যায় না।
মন্তুর পায়ের গতিটা শ্লথ হয়ে এল।
উঠোনে সালেহা আর ফকিরের মা বসে, মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে ওরা।
আম্বিয়ার চাচা আজ বলেছে, সামনের শুক্রবার জুমার নামাজের পর গাঁয়ের মাতবরদের কাছে কথাটা তুলবে সে। বিচার চাইবে।
ফকিরের মা বলল, আমি কিন্তুক একটা কথা কইয়া দিলাম বউ। এই মাইয়া একেবারে অলক্ষুইণা। যেই ঘরে যাইবো সব পুড়াইয়া ছাই কইরা দিবো।
সালেহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক কইছ চাচি।
কথাটা বলতে গিয়ে আমেনা আর ফাতেমার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। আম্বিয়ার জন্যেই তো ওদের তালাক দিয়েছে বুড়ো মকবুল।
নিজেও পড়েছে মরণ রোগে।
উঠোনে এসে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল মন্তু।
সালেহা আর ফকিরের মা কথা থামিয়ে তাকাল ওর দিকে।
টুনি কিছু বলল না। একটু নড়লো না। চুপচাপ রইল।
মন্তু ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দিল।
কাল ভোরে আবার বেরুতে হবে ওকে।

।। দশ ।।

অবশেষে মকবুল মারা গেল।
ধলপহর হওয়ার অনেক আগে যখন সারা গ্রাম ঘুমে অচেতন তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিল সে।
সারা রাত কেউ ঘুমাল না।
গনু মোল্লা, আবুল, রশীদ, সালেহা, মন্তু, টুনি সবাই জেগে রইল মাথার পাশে।
সন্ধ্যাবেলা ফকিরের মা বলছিল লক্ষণ বড় ভালা না।
তোমরা কেউ ঘুমায়ো না মিয়ারা, জাইগা থাইকো।
বহুলোককে হাতের ওপর দিয়ে মরতে দেখেছে ফকিরের মা। তাই, রোগীর চেহারা আর তার ভাবভঙ্গি দেখে সে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।
সারা রাত প্রলাপ বকেছে বুড়ো মকবুল।
কখনো আমেনার নাম ধরে ডেকেছে সে। কখনো ফাতেমার জন্য উতলা হয়ে ওঠেছে। আবার কখনো প্রলাপের ঘোরে গরু তাড়িয়েছে। হুঁ হট-হট। আরে মরার গরু চলে না ক্যান। হুঁ হট-হট।
মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ কুরআন শরীফ পড়লো গনু মোল্লা।
তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল বুড়ো মকবুল। প্রলাপ বন্ধ হল।
একটু পরে মারা গেল সে।
ওর বুকের ওপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল টুনি।
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সে।
তার বিলাপের শব্দ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে দূরে পরীর দিঘির পাড়ে মিলিয়ে গেল।
বিস্ময়ভরা চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু।
পরদিন দুপুরে বুড়ো মকবুলের মৃতদেহটা যখন কাফনে আবৃত করে খাটিয়ার ওপর তোলা হল তখন বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠোনের মাঝখানে ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাতে লাগল টুনি। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নানা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল ওকে। সালেহা, ফকিরের মা, সুরতের বউ ওরাও অনেক কান্নাকাটি করল অনেকক্ষণ ধরে।

পরীর দিঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলকে কবর দিয়ে আসার পর সবার মনে হল বাড়িটা যেন কেমন শূন্য হয়ে গেছে। একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে গাছের পাতায়। ঘরের চালে। উঠোনে। বাড়ির পেছনে। ছোট্ট পুকুরে। আর সবার মনে। একটি লোক দীর্ঘদিন ধরে একবারও ঘরের দাওয়ায় বেরুতে পারেনি, বিছানায় পড়েছিল। যার অস্তিত্ব ছিল কি ছিল না সহসা অনুভব করা যেত না, সে লোকটা আজ নেই। কিন্তু তার এই না থাকাই যেন সমস্ত থাকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে।

সারা দুপুর টুনি কাঁদল।

সারা বিকেল।

সারা সন্ধ্যা।

সালেহা অনেক চেষ্টা করে ওকে কিছু খাওয়াতে। সে খেল না।

ফকিরের মা বলল, কিছু খাও বউ। না খাইলে শরীর খারাপ অইয়া যাইবো। কিছু খাও।

তবু খেল না টুনি।

মন্তু, সুরত আলী, আবুল, রশীদ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেউ দাওয়ায়, কেউ উঠোনে, কেউ দোর-গোড়ায় বসে। আজ সহসা যেন সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

মিয়াবাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে গামছাটা কাঁধে চড়িয়ে নামাজ পড়তে চলে গেল গনু মোল্লা। সুরত আলী, রশীদ আর আবুলও উঠে দাঁড়াল।

রোজ যে তারা নামাজ পড়ে তা নয়। কিন্তু আজ পড়বে। বুড়ো মকবুলের মৃত্যু হঠাৎ পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে ওদের।

পুকুর থেকে অজু করে এসে সুরত আলী বলল, কই যাইবা না মন্তু মিয়া ?

মন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল, চলো।

বলতে গিয়ে গলাটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠলো ওর।

দিন তিনেক পর নৌকা নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল মন্তু।

টুনি ডাকলো, শোন।

মন্তু তাকিয়ে দেখল এ কয়দিনে ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি।

চোয়ালের হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে তার। মুখখানা বিষণ্ন। মাথায় ছোট একটা ঘোমটা।

মন্তু বলল, কি।

টুনি চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে করে বলল, আমার একটা কথা রাইখবা ?

মন্তু বলল, কও।

মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল টুনি। তারপর আস্তে করে বলল, আমারে একদিন সময় কইরা আমাগো বাড়ি পৌঁছায়া দিয়া আইবা ? টুনির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে।

বুড়ো মকবুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির সাথে সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে টুনির। আর কতদিন এখানে এমনি করে পড়ে থাকবে সে।

মন্তু আস্তে করে বলল, ঠিক আছে যামুনি। কোন্ দিন যাইবা ?

টুনি মৃদু গলায় বলল, যেই দিন তোমার সুবিধা হয়। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল সে।

মন্তু বিব্রত বোধ করল। কি বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না সে।

টুনি একটু পরে কান্না থামিয়ে বলল, বড় ইচ্ছা আছিল তোমার বিয়া দেইখা যামু, তোমার হাতে মেন্দি পরাইয়া যামু। থাকন আর গেল না।

এ কথার আর উত্তর দিলো না মন্তু। গাঁয়ে সবাই জানে, সামনের শীতে আম্বিয়াকে বিয়ে করছে ও। টুনিও জানে।

কাপড়ের আঁচলে চোখের পানি মুছে টুনি আবার বলল, বিয়ার সময় আমারে নাইয়র আনবা না ?

নিস্তেজ গলায় মন্তু পরক্ষণে বলল, আনমু।

সহসা ওর চোখের দিকে মুখ তুলে তাকালো টুনি। এক টুকরো ম্লান হাসিতে ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠলো ওর। আস্তে করে বলল, কথা দিলা মনে থাকে যেন।
মন্তু বলল, থাকবো।
একে একে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিল টুনি।
সবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদল সে।
পরীর দিঘির পাড়ের ওপর দিয়ে আসার সময় দূর থেকে বুড়ো মকবুলের কবরটা চোখে পড়ল। শুকনো মাটির সাদা ঢেলাগুলো টিপির মতো উঁচু হয়ে আছে। সেদিকে তাকাতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি এক অজানা ভয়ে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে যেন।
ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিল মন্তু।
সেই নৌকা।
যার মধ্যে চড়িয়ে টুনিকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল সে। দুধারে গ্রাম। মাঝখানে নদী। যতদূর চোখে পড়ে শুধু অথই জলের ঢেউ। বর্ষার পানিতে নদী নালা ক্ষেত সব এক হয়ে গেছে। এ সময়ে ভরা নদী দিয়ে নৌকা চালানোর প্রয়োজন হয় না। খেতের ধারে গেরস্থ বাড়ির পেছনের ডোবার পাশ দিয়ে নৌকা চালিয়ে নেয়া যায়। এতে করে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।
টুনি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে রইল। মাথায় ছোট একখানা ঘোমটা।
মন্তু সহসা বলল, বাইরে আইসা বস না। গায়ে বাতাস লাইগবো।
টুনি পরক্ষণে বলল, আইতাছি। কিন্তু সহসা এল না সে।
এল অনেকক্ষণ পরে।
বাইরে কাঠের পাটাতনের ওপরে ছোট হয়ে বসল টুনি।
সেই নদী।
পুরনো নদী।
আগে যেমনটি ছিল তেমনি আছে।
আজ নদীর জলে হাতের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে খেলা করল না টুনি।
উচ্ছল দৃষ্টি মেলে তাকাল না কোনোদিকে।
শুধু বলল, আম্বিয়ারে বিয়া কইরলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না ?
মন্তু সংক্ষেপে বলল, হু।
টুনি বলল, বিয়ার পরে এই বাড়িতে থাইকবা, না আম্বিয়াগো বাড়ি চইলা যাইবা ?
এ কথার কোনো জবাব দিল না মন্তু। সে শুধু দেখল, ঘোমটার ফাঁকে একজোড়া চোখ গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।
উত্তর না পেয়ে টুনি আবার বলল, চুপ কইরা রইলা যে ?
মন্তু হঠাৎ দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল, শান্তির হাট।
টুনি চমকে তাকাল সেদিকে।
ভাটার স্রোত ঠেলে নৌকাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শান্তির হাটের দিকে। সারবাঁধা দোকানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।
সহসা জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল মন্তু। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল নৌকা। পড়তে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল টুনি। মাথার ওপর থেকে ঘোমটাটা পড়ে যেতে পরক্ষণে সেটা তুলে নিল আবার। মন্তু এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গভীরভাবে কি যেন দেখছে সে।
নৌকাটাকে ঘাটের দিকে এগোতে দেখে টুনি বলল, ঘাটে ভিড়াইতাছ ক্যান, নামবা নাকি ?
মন্তু চুপ করে রইল।
টুনি আবার বলল, হাটে কি কোনো কাম আছে ?

মন্তু মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ মরিয়া গলায় বলল, মনোয়ার হাজিরে কথা দিছিলাম ওর ওইখানে এক রাইতের লাইগা নাইয়র থাকুম। চল যাই।
টুনির দেহটা ধরে কে যেন একটা সজোরে নাড়া দিল। মুহূর্তে চোখজোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল ওর। মন্তুর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে।
মন্তু আবার বলল, মনোয়ার হাজিরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিবো। আবেগে গলাটা কাঁপছে ওর।
টুনির চোখের কোণে তখনও দুফোঁটা জল চিকচিক করছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়াল সে। আর অতি চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলল, না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল সে। হাতের বৈঠাটা ছেড়ে দিয়ে বোবা চাউনি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু। একটা কথাও আর মুখ দিয়ে বেরুল না ওর।
তারপর।
তারপর নদীর স্রোত বয়ে চলল। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে।
সেদিন হাটবার। সওদা করে বাড়ি ফিরছে মন্তু। দুই পয়সার পান।
এক আনার তামাক। আর দশ পয়সার বাতাসা।
কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের শুরু। ঘরে ঘরে ধান উঠছে। অনেক রাত পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম থাকে না। কাজ আর কাজ। সারাদিন ধান কেটে এনে পাহারা দিয়ে রাখে। রাতে গরু দিয়ে মাড়ায়। তারপর ঝেড়ে মুছে সব পরিষ্কার করে রাখতে রাখতে রাত অনেক গড়িয়ে পড়ে।
হাট থেকে বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখে, উঠোনে আসর জমিয়ে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত আলীর বড় ছেলেটা। মৃত বাবার এ গুণটি অতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছে সে। দূর থেকে শুনলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। মনে হয় সুরত আলী বুঝি বসে বসে পুঁথি পড়ছে।

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।

আজ উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়ল মন্তুর।
বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী।
কেউ নেই।
জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।
টুনির সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক বছর।
প্রথম প্রথম খোঁজ খবর নিত। আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মন্তুর। সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।
হীরন আজকাল বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। বহু আগে প্রথম স্বামী তালাক দিয়েছে ওকে। আবার বিয়ে হয়েছিল। বছর তিন চারেক ঘর-সংসার করার পর সেখান থেকেও তালাক পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর আর বিয়ে হয়নি।
আবার ওর একটা ভালো দেখে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মন্তু। এখন সে বাড়ির কর্তা। সবার বড়। যেকোনো কাজে সবাই এসে পরামর্শ নেয় ওর।
উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওর হাত থেকে পান, তামাক আর বাতাসাগুলো এগিয়ে নিল আম্বিয়া। তারপর কোলের বাচ্চাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, দুপুর থাইকা কানছে, একটু কোলে নাও।
কোলে নিয়ে ছেলেকে আদর করল সে।
মন্তুকে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে আসরের মাঝখানে বসাল ওকে। এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে এনে ওর হাতে দিয়ে গেল আম্বিয়া। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল। চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিমে।
উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। পরীর দিঘির পাড়ে একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেল। সুরত আলীর ছেলেটা তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেল।

কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী।

সুর করে ঢুলে ঢুলে এক মনে পুঁথি পড়ছে সে।
রাত বাড়ছে।
হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।

অনুশীলনী

হাজার বছর ধরে

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ থেকে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আরে, একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক। পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয় তো তালাক দিয়া দিব। মন্তু সহসা কিছু বলল না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আম্বিয়াকে অনেক ভালো লাগছিল তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলত, তাহলে তক্ষুনি রাজি হয়ে যেত সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্তু।

১. অনুচ্ছেদে প্রথম বাক্যটির বক্তা কে?
- ক. ছমির শেখ
- খ. মকবুল
- গ. নন্তু শেখ
- ঘ. গনু মোল্লা

২. আম্বিয়াকে বিয়ে করতে মন্তুকে আজ ভাবতে হচ্ছে – কারণ
- ক. তার আর্থিক দুরবস্থা
- খ. আম্বিয়া তার যোগ্য নয়
- গ. টুনির কথা চিন্তা করে
- ঘ. আম্বিয়ার অসুস্থতার কথা ভেবে

৩. তুচ্ছ কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মানসিকতা দূর করার জন্য প্রয়োজন–
- i. নারীজাগরণ ও গণসচেতনতা
- ii. পারিবারিক আইন সংস্কার
- iii. পুরুষদের মনোভাব সংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii
- খ. ii
- গ. i ও iii
- ঘ. iii

৪. অনুচ্ছেদে বক্তার উক্তিতে তার চরিত্রের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে?

i. স্বার্থপরতা
ii. নারী বিদ্বেষ
iii. প্রতাপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i, ii ও iii
ঘ. iii

৫. 'রসুনের মতো সাদা-হলুদে মেশানো গায়ের রঙ'– কার সৌন্দর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে?

ক. আবুলের খালাতো বোন
খ. আবুলের মামাতো বোন
গ. ফাতেমার খালাতো বোন
ঘ. ফাতেমার মামাতো বোন।

৬. "তাল গাছের ডগায় ঝুলানো বাবুই পাখির বাসায়ও কিছুকালের জন্য পরম নিশ্চিন্তে ঘর বেঁধেছিল পুঁটি মাছের ঝাঁক।" –এটি একটি

ক. উপকথা
খ. রূপকথা
গ. জনশ্রুতি
ঘ. কুসংস্কার

৭. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও। বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির ওপরে যে ছোট জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল।

উল্লিখিত ঘটনাটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের কোন অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়?

i. নারী নির্যাতনের
ii. অভাব অনটনের
iii. নারীর অসহায়ত্বের

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. iii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

৮. 'ফসলের দিন' বলতে বোঝানো হয়েছে–
   ক. আষাঢ়-শ্রাবণ মাস
   খ. আশ্বিন-কার্তিক মাস
   গ. অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস
   ঘ. ফাল্গুন-চৈত্র মাস।

৯. মকবুল গরু দিয়ে ধান মাড়ায় না, স্ত্রীদের দিয়ে মাড়ায়, কারণ সে –
   i. মমত্বহীন
   ii. দরিদ্র
   iii প্রতাপশালী

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে দু'দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে। প্রথম বউ আয়েশা। স্বামীর প্রচণ্ড মার খেয়েও এতটুকু প্রতিবাদ করেনি। ভেদবমি করে মারা গেছে। দ্বিতীয় বউ জামিলা প্রতিবাদ করতে চেয়েও পারেনি, পরিণামে আরও মার খেয়ে মরতে হয়েছে তাকে। আজকাল তৃতীয় বউ হালিমাকে যখন মারে তখন পরিবারের কেউ কিছু বলে না– কেননা আবুলকে বলার কিছুই থাকে না।

   ক. উদ্ধৃতি অংশে সমাজের কোন চিত্র ফুটে উঠেছে?
   খ. হালিমাকে নির্যাতিত হতে দেখেও পরিবারের কেউ কিছু বলে না কেন?– ব্যাখ্যা কর।
   গ. এই একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে আয়েশা ও জামিলার সাথে আজকের নারীসমাজের কী ধরনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়– আলোচনা কর।
   ঘ. অনুচ্ছেদটিতে যে তিনটি নারীচরিত্র আছে তাদের প্রতি আচরণের দিকটি মূল্যায়ন করে তৎকালীন নারীর সামাজিক অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রঙিন শাড়ি পরে বেরুলে কী হবে, ওদের চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না হযরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন ওরা একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কাণ্ড কইরা বইসলেন তিনি। খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেল ওলা বিবির।

   ক. ওলা বিবি কে?
   খ. উল্লিখিত তিন বিবি মানুষের যে সর্বনাশ করে তার পরিচয় দাও।
   গ. অনুচ্ছেদে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, বর্তমান যুগে তা কতখানি সংস্কারমুক্ত বলে তুমি মনে কর? যৌক্তিকতার সঙ্গে উপস্থাপন কর।
   ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, তৎকালীন সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল।

৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যার বিয়ে, সেই হীরন রসুই ঘরের দাওয়ায় চুপটি কর বসে রয়েছে– অবাক হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে দুপুর রাতে পাড়াপড়শিরা অনেকে এল। কাচ্চা–বাচ্চা, ছেলেমেয়ের দল। দুখানা বড় বড় চাটাই বিছিয়ে নিয়ে উঠোনে বসল ওরা। তারপর সবাই একসঙ্গে সুর করে গান ধরল।

"মেহেদি তোমরা লাগ কোন কাজে।
আমরা লাগী দুলহা় কইন্যারে সাজে।"

ঢেঁকির উপরে তখন আম্বিয়াও গান ধরেছে–

ক. গান গাইল কারা?

খ. অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

গ. তোমার দেখা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার তুলনামূলক আলোচনা কর।

ঘ. উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হীরনের বিয়েতে পরিবারের সম্মিলিত ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

কবর

(নাটক)

মুনীর চৌধুরী

কবর

(মঞ্চে কোনোরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হইবে না। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময়, অশরীরী পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে হইবে।

দৃশ্য : গোরস্থান। সময় : শেষ রাত্রি।

তিন চার ফুট উঁচু একটি পুরু কাল কাপড়ের মজবুত পর্দার দ্বারা মঞ্চটি দুই অংশে বিভক্ত, লম্বালম্বিভাবে নয়, পাশাপাশি। সামনের অংশে কী ঘটিতেছে সবই দেখা যাইবে; কিন্তু বিভক্ত মঞ্চের পশ্চাৎ অংশে কেহ দাঁড়াইলে দর্শকের চোখে পড়িবে না।

পর্দা উঠিলে দেখা যাইবে খালি মঞ্চের ডান কোণে একটি লণ্ঠন টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। সামনে একটি মোটা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ, মুখ খোলা। পাশে একটি ছোট গ্লাস, খালি। একটি রুমাল মাটিতে পাতা রহিয়াছে। মনে হয়, এইমাত্র তাহার উপর কেহ বসিয়াছিল। সেই লোকটিই মঞ্চের ভিতরে আবার ঢুকিল। হৃষ্টপুষ্ট বড়-সড় শরীর। চালচলন গণ্যমান্য নেতার মতো। ভারিক্কী উপযুক্ত সাজগোজ। ভিতরে ঢুকিয়াই আবার ডাকিল -)

নেতা : গার্ড ! গার্ড !

(নীল কোর্তা পাজামা পরা গার্ডের প্রবেশ। পায়ে খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতা। পাজামার প্রান্তদেশ মোজার মধ্যে গোঁজা। হাবভাবে প্রভুভক্তির ঝলক, কিন্তু আপাতত একটু হতবুদ্ধি ও ভয়ার্ত ভাব। হাতে নিভন্ত লণ্ঠন। ছুটিয়া প্রবেশ।)

গার্ড : জী হুজুর। *(দ্রুত নিঃশ্বাস)*

নেতা : কী রকম গার্ড দিচ্ছ ? তোমাদের পাহারা দেবার এই নাকি নমুনা ? ছিলে কোথায় এতক্ষণ ? কতক্ষণ ধরে ডাকছি কোনো সাড়া নেই।

গার্ড : পরথম পরথম ঠাওর করতে পারি নাই হুজুর। এমন ঠান্ডা আর আন্ধার হুজুর যে, কানের মধ্যে খামুখাই কেবল ঝাঁ ঝাঁ করে।

নেতা : তোমার পোস্টিং কোথায় ছিল ?

গার্ড : ঐ পশ্চিম কোণে। ঐ কিনারের শেষ লাল বান্ধানো কবরের পাড়।

নেতা : ওখান থেকে এখানে আসতেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছ ? বাহাদুর গার্ড দেখছি। বাতি নিভিয়ে রেখেছ কেন ?

গার্ড : *(চমকাইয়া হাতের লণ্ঠন দেখে)* ওহ্! এ্যা, পইড়া গ্যাছলাম। তাড়াতাড়ি কইরা আইতে গিয়ে পইড়া গ্যাছলাম গর্তের মধ্যে।

নেতা : গর্তে ?

গার্ড : কবর। পুরান কবর হইব। একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই একদম ভস্ কইরা ভিতরে ঢুইকা গেছি।

নেতা : Idiot ! চোখ মেলে পথ চলো না ? খেলার মাঠ পেয়েছ নাকি ? এটা গোরস্থান। সাবধানে পা ফেলতে

পার না ? যাও। ডিউটিতে যাও।

(অন্যদিক হইতে নিঃশব্দে প্যান্ট-কোট-মাফলার চাদর জড়ানো কিম্ভুতকিমাকার এক ব্যক্তির প্রবেশ। নেতা তাহাকে লক্ষ করে নাই।)

গার্ড : জী হুজুর। *(স্যালুট)*

নেতা : যাওয়ার পথে আবার আরেকটার মধ্যে পোড়ো না। কাতার দেখে আল দিয়ে চলবে। যাও। কোনো কাজ নেই। এমনি ডেকেছিলাম। বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ো।

গার্ড : জী-হুজুর। (স্যালুট ও প্রস্থান।)

ব্যক্তি : (নেতার পেছন হইতে) তখনই বলেছিলাম স্যার এসব আজেবাজে লোক ?

নেতা : *(চমকাইয়া)* কে ? তুমি কে ?

ব্যক্তি : আমি স্যার, ইন্সপেক্টর হাফিজ।

নেতা : ওহ ! আপনি ! এমন করে নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চম্‌কে ওঠেছিলাম। ভবিষ্যতে ওরকম আর করবেন না। না, ভয় পাইনি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারে নি। তবু ডাক্তার বলেছে আমার নাকি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে। কী বলছিলেন বলুন- *(বসিয়া গ্লাসটা হাতে লইবে এবং অন্যমনস্কভাবে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটার মুখ খুলিবে।) ইন্সপেক্টর হাফিজ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু নজর পুরাপুরি নেতার হাতের দিকে।)*

হাফিজ : এই বলছিলাম, এ সব হাবা-গোবা লোক সঙ্গে না আনলেই পারতেন। কাজ বানাবার চেয়ে পন্ড করাতেই বেটারা বেশি পটু।

নেতা : তা হোক। ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটত না।

হাফিজ : এটা স্যার ঠিকই বলেছেন। সব একেবারে হারামির বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবি হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না। এজন্যই তো আজকাল কোনো অফিসেই ফেইথ-ডিসিপ্লিন এগুলো খুঁজে পাবেন না স্যার।

নেতা : হুম্ *(ব্যাগটা আবার দেখেন। চারিদিকে কী যেন খুঁজিতেছেন।)*

হাফিজ : তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই। তা ছাড়া শহরে কারফিউ লাগানো থাকতে এখানে গার্ডের কোনো দরকার ছিল না। কটাই বা লাশ আর। গোর-খুঁড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম। তার ওপর শীতের মধ্যে আপনি কষ্ট করে ....

নেতা : কিছু কাজ আছে যা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তা সে যতই পটু হোক না কেন। *(দাঁড়াইয়া খুঁজিতে থাকে।)*

হাফিজ : কিছু খুঁজছেন স্যার ?

নেতা : হ্যাঁ। একটা বোতল, এ গ্লাসটার পাশেই ছিল। ভূত-জিনে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করলেও, তারা কেউ এসে একেবারে বোতল সমেত আমার হুইস্কি শেষ করে যাবে–মনে হয় না। একটু আশেপাশে খুঁজে দেখুন তো, আমিই ভুলে কোথাও ফেলে গেছি নাকি।

হাফিজ : ব্যাগের ভেতর পুরে রাখেননি তো ?

নেতা : না। ওগুলো ভরা বোতল। এটা কিছু খালি হয়েছিল।

হাফিজ : ওহ্! তাইতো! এ-তো বড় সাংঘাতিক কথা! না না। ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার। বোতলটা কী রকম স্যার?

নেতা : না খেয়ে থাকলে বোঝানো যাবে না।

হাফিজ : না স্যার, মানে স্যার আমি, বোতলটার শেপ্-গড়নের কথা বলছিলাম।

নেতা : ওহ্ খুঁজে দেখুন। আমি নতুন একটা খুলছি, আপনি ওটার খোঁজ করুন।

হাফিজ : *(দর্শকদের দিকে পিছন দিয়া, মেঝের অন্য কোণে উপুড় হইয়া কী খোঁজে। তারপর মাটিতে একবার হাত ঠেকাইয়াই চিৎকার করিয়া উঠে।)* পেয়েছি! পেয়েছি! স্যার! এই যে! এইটে না স্যার? *(একটি খালি মদের বোতল তুলিয়া দেখায়।)*

নেতা : অত জোরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবেন না। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো দিন ভয় পাইনি, এটা ঠিক। তাহলেও এটা গোরস্থান। খেলার মাঠ নয়। হঠাৎ চেঁচালে বুকে লাগে। আপনাকেও বলেছি একবার। দেখি। হ্যাঁ। বোতল এটাই।

হাফিজ : কিন্তু, মানে, একদম খালি যে স্যার!

নেতা : তাতে ক্ষতি নেই। যে খেয়েছে সে যে বোতলসুদ্ধ সাবাড় করতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই আমাদের জন্য এরকম জায়গায় সুখের কথা। অন্তত ভয়ের কথা নয়।

হাফিজ : ভয়? কী যে বলেন স্যার। মানে আমি ভেবেছিলাম হয়ত এমনিতেই কারো পায়ের ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সব হয়ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঐ গার্ড ব্যাটার কাণ্ড। কবরের গর্ত থেকে উঠে এসে সোজা আপনার বোতলের ওপরই হয়ত আবার হোঁচট খেয়েছে। অমন দামি জিনিসটা নষ্ট করে দিল স্যার!

নেতা : আপনাকে প্রথম ভেবেছিলাম নেহায়েৎ সরকারি কর্মচারী। এত দরদি লোক বুঝিনি।

হাফিজ : সব মাটিতেই পড়েছে স্যার। হাত দিয়ে দেখলাম। জায়গাটা ভিজে একেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে।

নেতা : আপনার এ চাকরি নেওয়া সার্থক হয়েছে। এবার একটু বসে আরাম করুন। ভয়ংকর ঠান্ডা। আপনার পা সুদ্ধ কাঁপছে।

হাফিজ : অ্যা! পা? টলছে–মানে, কাঁপছে? ওহ্! হ্যাঁ, তাইতো, ইস্ কী বেজায় শীত। একটু বসি তাহলে স্যার, এ্যা? *(নেতা তখন হোৎকা পোর্টফোলিও ব্যাগ হইতে নতুন বোতল খুলিয়া ক্রমাগত ঢালিতেছেন।)*

নেতা : ওদিককার কাজ কতদূর এগুলো? আর কতক্ষণ দেরি হবে?

হাফিজ : প্রায় হয়ে এল বলে। এতক্ষণে সব চুকে দু-একটা বেজে যেত। গোলমালে কাজে বাধা না পড়লে-কখন সব শেষ করে ফেলতাম–

নেতা : গোলমাল! এখানেও গোলমাল? গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার! ঐ গোর-খুঁড়েগুলো দু-একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরি হয়ে গেল।

নেতা : আপত্তি ? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোনো গোলমাল করেননি তো ? আপনাকেও বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়েও বেশি ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেব। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হয় কেন ? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

হাফিজ : সে কি স্যার আমি বুঝিনি ? সরকারের কাজে সরকারি টাকা খরচ করতে আমি পেছ-পা হব কেন ? তবে ঐ ছোটলোকগুলোর আবার অদ্ভুত সব ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে কিনা তাতেই যত ফ্যাঁকড়া বাধে। মুজুরি তো ষোল আনা আদায় করবেই, তার ওপর ধর্মের নাম করে সাত রকম ফষ্টিনষ্টি। কুসংস্কারই দেশটাকে খেল স্যার !

নেতা : আমার বক্তৃতা আমাকে শোনাবেন না। আসলে কী ঘটেছে তাই বলুন।

হাফিজ : হাসপাতাল থেকে লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনেহেঁচড়ে গাড়িতে তুলতে হয়েছে। তার ওপর এতখানি পথ ট্রাকে আনা, ঝাঁকুনি কিছু কম খায়নি। আর ডাক্তারগুলোও যেমন পশু, মড়াগুলোকে কেটে-কুটে একেবারে নাশ করে রেখেছিল।

নেতা : এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না। তবু আপনাকে বলেছি আমার হার্ট একটু উইক। বেশি স্ট্রেইন সহ্য হয় না। বাজে কথা না ঘেঁটে আসল কথাটা বলুন।

হাফিজ : যা হবার তাই হয়েছে। টানা-হেঁচড়ায় আর ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গাড়ির মধ্যেই লাশগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। কাটা টুকরাগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় এখন আর বোঝবার উপায় নেই, কোনটার সঙ্গে কোন্‌টা যাবে।

নেতা : তাতে কী হয়েছে ? *(নতুন বোতল খুলিবে)*

হাফিজ : আরেকটা খাচ্ছেন স্যার ? মানে, তাই দেখে আমি গোর-খুঁড়েগুলোকে বললাম, আলাদা আলাদা করে অতগুলো কবর বানিয়ে কী দরকার। একটা বড়-মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়।

নেতা : Resourceful officer ! আপনার নামটা মনে রাখতে হবে। সকাল বেলায়ই একবার পার্টি হাউসে আসবেন, রিকমেন্ডেশন লিখে দেব।

হাফিজ : মেহেরবানি স্যার। পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসাররাই কেবল কিছু পেলাম না। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে আমাদের এখনও সেই দশা। যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কী করে ? আমাদের তো কোনো রাজনীতি নেই স্যার ! সরকারই মা-বাপ ! যখন যে দল হুকুমত চালায় তার হুকুমই তামিল করি।

নেতা : এর মধ্যে গোলমালটা কিসের ? আপত্তি উঠল কোথায় ?

হাফিজ : এ্যা ? ওহ্। ইয়ে-মানে, ঐ গোর-খুঁড়ে। বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা 'কভি নেহি'। বলে কিনা 'মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই? তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না ? এ হতে পারে না, কভি নেহি।' গো ধরে বসে রইল। কত বোঝালাম।

নেতা : আহাম্মকি করেছেন। সরকারি কাজ করেন কিনা ! পাবলিক সেন্টিমেন্ট বোঝেন না। বোঝাতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের খুশিমতো কাজ করতে দিলে আপনার ইজ্জত ডুবত ? কাজ আদায় করা নিয়ে আপনার কারবার। সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে সরকার বেতন দেয় না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আকাশ ফরসা হয়ে যাবে–আযান পড়বে–কারফিউ শেষ হবে। লাশগুলো

নিয়ে আপনি এখনও মিটিং করছেন ?

হাফিজ : আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।

নেতা : তাহলে এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন ?

হাফিজ : ঐ তখনই তো স্যার আরেকটা নতুন ফ্যাকড়া বাধল। কোথ্থেকে ছুটে এসে ঐ মুর্দা ফকির চ্যাচামেচি শুরু করে দিল।

নেতা : কে ? আপনাকে এতবার করে বলেছি, দম্‌কা দম্‌কা একেকটা উদ্ভট কথা আমাকে বলবেন না। ধড়াক করে বুকে লাগে ! যা বলবার তা অত নাটক করে টিপে টিপে না বলে খোলাখুলি প্রথমেই সবটা বলে ফেলতে পারেন না ? (বুকে হাত বুলাইয়া) এই মুর্দা ফকিরটি কে আবার ? কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে নাকি? কারফিউর মধ্যে এখানে ঢুকল কী করে ? গার্ডগুলো কী করছিল ?

হাফিজ : এখানেই থাকে স্যার। গোরস্থানের বাইরে কখনও যায় না বলেই তো ওই নাম। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কবরের সঙ্গে আলাপ করে। পাগল ! বদ্ধ পাগল !

নেতা : হুম !

হাফিজ : লোকটা এমনিতেই ভালো লেখা পড়া জানে। ভালো আলেম। গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে, মা-বৌকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে, মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্রাজিক স্যার !

নেতা : অনেক খবর রাখেন দেখছি।

হাফিজ : চাকরি। চাকরি স্যার। চারদিকের হরেক রকমের খোঁজ আমাদের রাখতে হয় স্যার।

নেতা : বেশি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিটাই কোথায় যেন খুইয়ে এসেছেন। মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি বলবেন কি, গোলমালটা কিসের ? লাশগুলো মাটিচাপা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? ঠান্ডায় আপনার মগজ জমে গেছে। কেবল এলোমেলো বকছেন। নিন। *(বোতলটা আগাইয়া দিয়া)* এক চুমুক টেনে নিন। শরীর গরম হবে। বুকে সাহস পাবেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন। নিন।

হাফিজ : আপনার সামনে স্যার ? তার ওপর স্যার এখন অন ডিউটি–

নেতা : তাকানোর সময় নেই। লাশগুলো মাটিচাপা দিয়ে কারফিউ শেষ হবার আগে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ঢিলেমির এটা সময় নয়। ধরুন। এক চুমুক টেনে চট্‌পট্ কাজটা শেষ করে ফেলুন।

হাফিজ : বোতলে মুখ লাগিয়ে খাব স্যার ?

নেতা : কেন, চুসনি লাগিয়ে দিতে হবে নাকি ?

(হাফিজ বোতলটা মুখে লাগাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া টানে টানে একদম খালি করিয়া ফেলিল। ঢক্ করিয়া বোতলটা মাটিতে রাখিয়া চোখ বড় করিয়া এক মুহূর্ত থম্ ধরিয়া থাকে। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া–)

হাফিজ : এই মালটা স্যার আরও ভালো। একেবারে কলজেয় গিয়ে ঘা মারে।

নেতা : মুর্দা-ফকির লাশগুলো দেখেছে ?

হাফিজ : এ্যা ! ওহ্ হ্যাঁ, মানে, না। বোধ হয় দেখেনি। ও ব্যাটার চলাফেরা কিছু ঠাওর করা যায় না। কোথ্থেকে হঠাৎ হুস্ করে একেবারে সামনে এসে পড়ে। বোধ হয় আড়াল থেকে গোর-খুঁড়েদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে থাকবে। আচমকা পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল। ঠিক আমাদের মাঝখানে। তারপর কী তুখোড় বক্তৃতা। আমি তো গোর-খুঁড়েদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম। এ-ব্যাটাই না কোথ্থেকে উড়ে এসে ওদের বোঝাতে শুরু করল : কিছুতেই না, একটা কবরেই কাজ সারতে হবে। যে হারে মানুষ মরছে তাতে নাকি শেষটায় ওর কবরের বাজারে ঘাটতি পড়ে যেতে পারে। দেখুন তো কী সব বিদঘুটে কথা !

নেতা : ওকে সুদ্ধ পুঁতে ফেললেন না কেন ?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার। মন ভুলিয়ে কাজ আদায় হলে জানে মেরে ফয়দা কী ? পাগলা আদমি, একটু তাল দিয়ে কথা বলতেই শুড় শুড় করে আমার সঙ্গে চলে এল। ওকে ওই দিকে পার করে দিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম, যেন আবার হামলা না করে। আর এই শালারাও সেই কখন থেকে শাবল চালাচ্ছে, এখনও নাকি খোঁড়াই শেষ হল না। *(ঘড়ি দেখিয়া)* এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রায় হয়ে এসেছে।

নেতা : *(গ্লাসে চুমুক দিয়া)* না। কাজটা ঠিক হয়নি। এসব ফকির দরবেশ বড় ধড়িবাজ লোক হয়। কোথ্থেকে কী উৎপাত সৃষ্টি করবে কে জানে।

হাফিজ : লাশ ও ব্যাটা দেখেনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না। রক্ত-মাংসের স্তূপ দেখে ও কী বুঝবে ? এ রকম লাশ তো ট্রেনে-চাপা মড়ারও হতে পারে।

নেতা : গুলি চলছে দুপুর বেলা। খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে, এফোঁড়-ওফোঁড়। ফকির হোক পাগল হোক–শহরে থেকেও এ খবর ওর কানে পৌঁছেনি, তা ভাবতে আমি রাজি নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ : মুর্দা-ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ওতো এক রকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবিতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলি করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে–এত কথা বোঝবার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায়–কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে-খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল !

নেতা : কিন্তু লাশগুলোকে কোথায় কবর দেওয়া হচ্ছে তা তো ও দেখেছে। সকাল বেলা যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয় ? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকাল বেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে ?

হাফিজ : আপনারা লিডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি অফিসার, হুকুম তামিল করেই খালাস। কী করতে হবে ? (স্তব্ধতা)

নেতা : ওটাকে সুদ্ধ পুঁতে দাও।

হাফিজ : এ্যা ? কী বলছেন স্যার ? আপনি এক্সাইটেড হয়ে গেছেন স্যার। আর খাবেন না এখন।

নেতা : আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনের-বিশ-পঁচিশ হাত। যত নিচে পার। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে, মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোনোদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, স্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

হাফিজ : আপনি বড় এক্সাইটেড স্যার। এ-সব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার। এক্সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিংই এ জন্য অন্যরকম। কোনো সময়ই আমাদের উত্তেজিত হতে নেই। ভান

করতে পারি কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা : পুঁতে ফেল।

হাফিজ : ভুল, খুব ভুল হবে। যা-ই করতে হয় স্যার খুব কুল্লি করতে হবে। এসব আমাদের রীতিমত প্রাকটিস করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ঐ দিকটা দেখে আসি। এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা : যান, তাড়াতাড়ি যান। আপনার কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাটা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আর বেশিক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ : এ্যা ! ওহ্-হে হে হে ! আপনার কথা শুনলে হাসি পায় ঠিক-কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হল যেন পড়ে যাব। বড্ডো ভয় পেয়ে গেছি স্যার। আরেকটু দেবেন স্যার ? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কাজ করতে পারব। এই নতুন বোতলটা কেমন স্যার ?

নেতা : *(চোখ তুলিয়া)* আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই দফায় একটু কমিয়ে দিলাম। *(গ্লাসে কিছুটা ঢালিয়া বোতলটা তুলিয়া দিলেন।)*

(নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই। সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ ময়লা চুল। তীক্ষ্ণ কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্লাস চুমুকে শেষ করিয়াছে।)

ফকির : *(হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া)* ঝুঁটা! *(হাফিজ ও নেতা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।)*

নেতা : কে ?

হাফিজ : এ্যা ! ওহ্ আপনি ? হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর।

ফকির : ঝুঁটা। মিথ্যেবাদী। আমাকে চিনতে পারে না। এ গোরস্থানে এমন কেউ নেই। জিন্দা-মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝ ? দেখলে চিনতে পারবে ?

হাফিজ : সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকির : ঝুঁটা ! তুমি কোনো পার্থক্য বোঝ না, কিচ্ছু চেন না। তুমি বাঁচার না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমিকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না। তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনও কবরে যাবে না। কবরের নিচে ওরা কেউ থাকবে না । উঠে চলে আসবে।

হাফিজ : আপনি তো এইদিকে ছিলেন। ওদিকে গেলেন কখন ?

ফকির : বাবা ! তোমরা শহরের অলি-গলি যেমন চেন, এ গোরস্থান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নিচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরি করেছি। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারব কেন ?

হাফিজ : হো হো হো। আপনি বড় মজার কথা বলেছেন হুজুর।

ফকির : এই তো ঠিক বুঝতে পেরেছ বাবা। তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট না করিয়েই ওপার চালান করে দেবে। পরীক্ষা না করে কি আর আমি এমনি যেতে দি !

হাফিজ : সালাম হুজুর। আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার ? মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ফকির : সাবাস বেটা। তোর নজর খুলছে।

হাফিজ : তা হুজুর এখন অনুমতি দিন, ওদের পার করে দি।

ফকির : না। আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। তাই না চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে এক্কেবারে তোদের ঢাকা মোটর গাড়ির ভেতর গিয়ে উঠলাম।

নেতা : ইন্সপেক্টর !

ফকির : প্রথমে দেখে মনে হল ঠিকই আছে। উল্টেপাল্টে দেখি, কোনোটার বুকের কাছে এক খাবলা গোশ্‌ত নেই, কোনোটার ফাটা খুলি দিয়ে কী সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম ঠিকই আছে। কবরের কাবেল। কিছু নয়, শেয়াল-শকুনে খামচে কামড়ে একটু খারাপ করে গেছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করে দেখি–না তো, ঠিক তো নেই। উহুম্‌।

হাফিজ : সে কি হুজুর। ঠিক। সব তো ঠিকই আছে।

ফকির : চোপরও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই। তোমরা চোরাকারবারি। আমি শুঁকে দেখেছি, গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ : গন্ধ ?

ফকির : বাসি মড়ার গন্ধ আমি চিনি না ? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন- এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ : ওহ্‌ ! তাহলে বলুন, কবর দেওয়া হয়ে গেছে। থাক। গন্ধ থাকুক। মাটির নিচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির : ওরা জোর করে কবর দিয়ে দিল। আমায়ও বলল না। আমিও তোমাদের কথা মানবো না। ও মুর্দা কবরের নয়। আমি ওদের ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ : খোদা হাফেজ।

(ফকির কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চারিদিক হইতে কী শুঁকিতে চেষ্টা করে। নিজের শরীরও শুঁকিয়া দেখে।)

ফকির : নাহ্‌, আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি-*(আগাইয়া আসিয়া একবার হাফিজের গা শুঁকিবে। তারপর ঝুঁকিয়া হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফোরিত করিয়া দেয়। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয়। মুখ-চোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া)* উহ্‌ ! তাই বল ! এইবার পেয়েছি। ব্যাটারা কী ভুলই না করেছে।

নেতা : ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকির : গন্ধ ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ ! তোমরা এখানে কী করছ ? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না ? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। *(গন্ধ শুঁকে)* তোমাদের গায়ে মুখে পাই মড়ার গন্ধ। তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছিঃ, এরকম ফাঁকি দেয় না । আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ইস্‌ ! গোর-খুঁড়েরা কী ভুলই না করেছে ! না, না এ তো হতে পারে না–

(বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরের প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে। প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিৎ বেসামাল।)

হাফিজ : হে হে হে হে স্যার। সব খতম স্যার। আমরা এখন ফ্রি। দেখলেন তো, পাগলটাকে কী রকম পোষ মানালাম। পাগলটাকে অত হুজুর হুজুর না বললে হয়ত গাঁয়ের দিকেই ছুটত। আর শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা : ভালো হত। তুলে নিয়ে আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

হাফিজ : ঐ একটা নোংরা কথা বারবার বলবেন না, স্যার। তাহলে আমিও আপনার সম্পর্কে দুএকটা হক কথা বলে ফেলব কিন্তু।

নেতা : যেমন ?

হাফিজ : যেমন ? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাততালি দেব।

নেতা : মারহাবা ! সাবাস ! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিক মতো উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কী করে ?

হাফিজ : অনেক দিন হল এ লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝব না ?

নেতা : সবটা ঠিক ধরতে পারেননি। উঠতে হয়ত কষ্ট হবে, কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিক দিতে পারব। কী, বিশ্বাস হয় না বুঝি ?

হাফিজ : বিশ্বাস ? হ্যাঁ ! পারবেন। তা পারবেন। আমি, আমি মানে আমার ব্রেনটাও ঠিক আছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে এখনও আমার ডিউটি ঠিক করে যেতে পারব। তবে, তবে মানে এই চোখ, আর কান খামোখাই একটু বেশি কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা : ভয় ? ভয় কিসের ? তুমি মনে করেছ ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই ? এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়েই যাব। কোথাকার আমার জিন্দা পীর এসেছেন–ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে।

হাফিজ : কিছু মনে করবেন না স্যার। একটা সওয়াল পুছ করছি আপনাকে। মনে করেন, সত্যি যদি ঐ মুর্দা ফকির লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে দাঁড়ায়-কী করবেন তখন আপনি ?

নেতা : সব্বাইকে, আপনাকে সুদ্ধ, একসঙ্গে পুঁতে ফেলতাম।

হাফিজ : আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে রসিকতা করিনি। ঐ মুর্দা ফকির শুনেছি অনেক কিছু জানে। কিন্তু যদি আসেও, আমি ভয় পাই না। একটুও না। প্রথমে হাসব। দেখব। এগিয়ে যাব। হাত মেলাবো। ভয় কিছুতেই পাব না। *(নিজের গলা দুই হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়া)* গ...লা টিপে ধরে রাখব। যাতে বুকের মধ্যে ভ....য় কিছুতেই ঢুকতে না পারে। আরেকটু দেবেন স্যার ? বুকে সাহস আসবে। কেমন জানি ইয়ে করছে।

(ততক্ষণে পার্টিশানের ঐ পাশ হইতে সকলের অলক্ষে ক্রমোজ্জ্বলিত আলোকশিখার কম্পিত গোলকের মধ্যে একটি ভয়াবহ মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বদনমণ্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। মূর্তি নিশ্চল। নেতা যখন শেষবারের মতো ইন্সপেক্টরকে পানীয় দিবার জন্য গ্লাসে বোতল উপুড় করিয়া ধরিয়াছেন, তখন ঐ স্তব্ধ মূর্তির একটি প্রায় অদৃশ্য হাত অন্ধকার হইতে কী যেন ছুঁড়িয়া মারিল। কাচের গ্লাসের ঝন্ ঝন্ শব্দ। নেতা ও হাফিজের ভয়ার্ত অস্ফুট চিৎকার।)

হাফিজ : গুলি ! গুলি স্যার ! শুয়ে পড়ুন শিগগির ! গুলি !

(দুইজনে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। পশ্চাতে কম্পিত শিখায় নিস্পন্দ মুখ। কয়েক মুহূর্তের সুতীব্র স্তব্ধতা।)

নেতা : *(চাপা স্বরে)* গুলি যে বুঝলে কী করে ?

হাফিজ : দেখেছি !

নেতা : কে ছুঁড়েছে তুমি দেখেছ ?

হাফিজ : না। তবে কী ছুঁড়েছে দেখেছি।

নেতা : কোথায় ?

হাফিজ : বেশি নড়বেন না। খুঁজে দেখছি পাই কিনা। *(উপুড় হইয়া একটু চারিদিকে হাতড়ায়। হঠাৎ কী তুলিয়া দেখে)* ধরুন, পেয়েছি।

নেতা : *(হাতে লইয়া)* এ কী ? এ যে বুলেট ! রক্তমাখা !

হাফিজ : কুল্‌লি ! কুল্‌লি ! ভয় পাবেন না স্যার। ভয় পেলেই সব গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ মুর্দা ফকিরের কাণ্ড। ট্রাকের ভেতর ঢুকে লাশের গা থেকে হয়ত খুলে নিয়ে এসেছে। সেগুলোই ছুঁড়ে মেরে এখন আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

নেতা : ও ! তাহলে বল– কিছু না। মুর্দা ফকির-সে তো জ্যান্ত আদমি। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাফিজ : এখন উঠে পড়া যাক স্যার। মিছেমিছি ভয় পেয়ে লাভ কী !

নেতা : ইন্সপেক্টর !

হাফিজ : জী।

নেতা : আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে–যে মেরেছে, সে এখনও আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাফিজ : এ্যাঁ !

নেতা : তুমি একটু ঘুরে একবার দেখ তো। আমিও তাকাচ্ছি।

হাফিজ : *(ধীরে মাথা ঘুরাইয়া দেখে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আপ্রাণ চেষ্টায় অস্বাভাবিক স্থি'র কণ্ঠে)* উঠে এসেছে।

নেতা : কে ?

হাফিজ : সেই লাশটা।

নেতা : লাশ ! কোন লাশটা ?

হাফিজ : বুলেট খাওয়া। ছাত্র। খুলি নেই।

নেতা : ওহ্ ! কী চায় ?

হাফিজ : চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব ?

নেতা : কী জিজ্ঞেস করবে ?

হাফিজ : এই, কী চায়, কেন উঠে এসেছে, ঠান্ডা লাগছে নাকি–এই সব ?

নেতা : আমাদের কথা বুঝবে ?

হাফিজ : ট্রাই করতে হবে। সব লাইনেই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুল্‌লি অগ্রসর হতে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব হতে বাধ্য। কিন্তু, অন্য রকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না। ফেইস করতেই হবে। *(উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্ট। নাটুকে মাতালের টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হইয়াছে তাহা স্পষ্ট।)*

নেতা : আপনি কিছু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাক্কা।

হাফিজ : খবরদার। অমন কাজও করবেন না। *(ফিস্‌ফিস্ করিয়া)* পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার। বুঝতে পারছেন না-এটা-ঠিক মানে, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ করুন, আমি কী রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেব। *(ধীরে ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে। বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করিতে চেষ্টা করে।)* এই ! এই ! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ? এই ! হেই ! *(মূর্তি নীরব। নিশ্চল।) (ঘুরিয়া)* স্যার, কোনো সাড়া দিচ্ছে না যে ?

নেতা : বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়ত কোনো কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। আমরা চল আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ : তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাব ? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরত না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না, স্যার।

মূর্তি : আমি যাব না। আমি থাকব। (দু'জনে হতবাক। ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যায়।)

হাফিজ : কোথায় যাবে না ? কোথায় থাকবে ?

মূর্তি : কবরে যাব না। এখানে থাকব।

হাফিজ : অবুঝের মতো কথা বল না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি : মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরব না।

হাফিজ : *(নেতার কাছে আসিয়া)* বড় একগুঁয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে, মনে হচ্ছে না। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার ? যদি কিছু আছর হয়। পারবেন না স্যার ? আপনি তো বলেছিলেন– যাই হোক–বক্তৃতা দিতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না স্যার।

নেতা : *(ভালো করিয়া শুনিয়া)* দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এ দেশের রাজনীতি আঙুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক। কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে, বসে–

মূর্তি : কবরে যাব না।

নেতা : আগে কথাটা ভালো করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি : ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা : জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মতো ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে তুমি

বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছ না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনও মরেনি-তাদের নামে-মিনতি করছি–তুমি যাও, যাও, যাও !

মূর্তি : আমি বাঁচব।

নেতা : কী লাভ তোমার বেঁচে ? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কী লাভ ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো কবরে চলে যাও। দেখবে, দুদিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। (মূর্তি মাথা নাড়ে) আমি ওয়াদা করছি, তোমাদের দাবি অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেব। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেব। তোমার দাবি এ্যাসেম্বলিতে পাস করিয়ে নেব। দেশজোড়া তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করব। যা বলবে তাই করব। দোহাই তোমার, তবু অমন স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মতো, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেক না। সরে যাও, চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

(সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুষ্ক রক্তরেখা।)

কে ? তুমি কে ?

মূর্তি (২) : নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানি ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ-ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামোখা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে।

নেতা : তুমিও এই দলে এসে জুটেছ নাকি ?

মূর্তি (২) : গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারব না।

নেতা : তুমি আমাকে চেন ?

মূর্তি (২) : চশমাটা আর খুঁজে পাইনি। অন্ধকারে আপনাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে আপনার গলা চিনি।

নেতা : আমার কথা শুনেছ ? এইমাত্র যা বলছিলাম ?

মূর্তি (২) : আপনি মিথ্যেবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড় মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।

মূর্তি : আমরা কবরে যাব না।

মূর্তি (২) : আমরা বাঁচব। *(বিড়বিড় করিতে করিতে পশ্চাতে গিয়া উপুড় হইয়া বসিবে। আর দেখা যাইবে না।)* *(নেতা মাথা নিচু করিয়া সরিয়া আসে। হাফিজ অগ্রসর হইয়া কানের কাছে বেশ জোরে ফিস্‌ফিস্ করিয়া)*

হাফিজ : হবে না। এ লাইনে ঠিক কাজ হবে না স্যার। অন্য রাস্তা ধরতে হবে। আমার মাথায় একটা প্লান এসেছে। দেখবেন ঠিক কাবু করে ফেলব। একটু ভোল বদলাতে হবে। সবই আমাদের করতে হয় স্যার। আপনি চুপ করে বসে দেখুন। *(হাফিজ চাদরটা খুলিয়া এক প্যাঁচ গায়ের উপর জড়াইয়া বাকি অংশ ঘোমটার মতো মাথার উপর তুলিয়া দিল।)*

নেতা : ঢং ছাড়। মেয়েলোকের মতো ঘোমটা দিয়েছ কেন ?

হাফিজ : *(ফিস্‌ফিস্ করিয়া)* চুপ ! আমি এখন স্ত্রীলোক। ঐ ছোকরার মা। কথা বলবেন না। দেখে যান। বুঝতে পারছেন না, সবাই একটু ঘোরের মধ্যে আছে, কিছু ধরতে পারবে না।

(আঁচল টানিয়া, ঘোমটা উঠাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে অনাবশ্যকভাবে স্ত্রীলোকের মতো করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তবে যথোপযুক্ত আবেগে ভরপুর।)

খোকা ! খোকা !

মূর্তি : *(চঞ্চল। বেদনাহত।)* কে ! কে ডাকে ?

হাফিজ : খোকা কোথায় গেলি তুই ? খো-কা !

মূর্তি : কে ? মা ? মা, তুমি কোথায় মা ? *(শূন্যে হাতড়ায়)*

হাফিজ : এই যে যাদু, আমি এইখানে।

মূর্তি : তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না মা ? তুমি বারণ করলে, তবু আমি শুনলাম না। রাস্তা থেকে ওরা ডাকল। আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তোমার কাছে বলতে গেলে পাছে তুমি বাধা দাও–সেই জন্যে তোমাকে কিছু না বলেই চুপে চুপে চলে গেছি। আজ যে ওরকম গোলমাল হবে তুমি আগে থেকে কী করে জানলে, মা ?

হাফিজ : মা হলে সব জানতে হয়। মা হলে জানতি, মার কষ্ট কী। মার বুক খালি হলে, মার কেমন লাগে, তুই দস্যু ছেলে বুঝবি না।

মূর্তি : তোমার সব কষ্ট বুঝি মা। নাক-মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে গেল। আমার তখন খালি কী মনে হচ্ছিল জান মা ? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছ। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম, তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-ঠিক তেমনি। আর আমার নাক-মুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে– ঝরছে।

হাফিজ : তবু তো কোনো কথা শুনিস না। তোরা কেবল মা'র দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস। এ তোদের কী নতুন নেশা ! এত মরণ-পাগল কেন তোরা ?

মূর্তি : মিছে কথা মা! আমরা কেউ মরতে চাইনি, মা। তোমার কাছে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করে না ? হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ব। তেল কমে এলে সলতে উস্‌কে দিয়ে পড়ব, আর তুমি বারবার এসে বকবে–কেবল বকবে। তারপর লণ্ঠন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। টেনে বিছানায় শুইয়ে দেবে। অন্ধকারে মশারির ফাঁক দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো ঘুমে জড়ানো তোমার ছোট্ট এলোমেলো শরীর দেখব–দেখব মা, চলে যেও না-মা, তোমায় আমি দেখব–তোমায় আমি আদর করব মা। তুমি কোথায় মা ? মা !

হাফিজ : ঘুমের ঘোরে কী বকছিস। স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি ? অনেক রাত হয়েছে, লক্ষ্মী বাবা, আর রাত জেগে পড়ে কাজ নেই। বিছানা করে রেখেছি। যাদু আমার, শুতে যা।

মূর্তি : আমাকে শুতে যেতে বলছ মা ? না, না। আমি শোব না। আমি এখন শোব না, মা। আমি আর কোনোদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা–না, না, আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব।

নেতা : ইন্সপেক্টর ! তোমার এই ভুতুড়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে ?

হাফিজ : ছিঃ বাবা, জিদ কর না। লক্ষ্মীটি, শুতে যাও। মার কথা শোন।

(দ্বিতীয় মূর্তি আচমকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়)

মূর্তি (২) : *(অস্পষ্টভাবে হাফিজের দিকে হাত বাড়াইয়া)* মিন্টু, মিন্টু। মিন্টু ঘুমায়নি এখনও ?

হাফিজ : (সুর পাল্টাইয়া) তোমার কোলে আসার জন্যে কাঁদছে।

মূর্তি (২) : দাও, আমার কোলে দাও। *(বাচ্চা কোলে লইবার ভঙ্গি করে)* ইস ! জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে গো !

নেতা : খবরদার! ফেলে দাও। ওটাকে ফেলে দাও কোল থেকে। এই শেষ বারের মতো বলছি, এখনও ভালো চাও তো সরে পড়। চলে যাও সব।

মূর্তি : আমি যাব না। আমি বাঁচব, মা। বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরও হাঁটব, মা। ঠান্ডা রূপোর মতো পানি চিরে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটব, মা।

মূর্তি (২) : কাঁদিসনে মিন্টু। তোর বাপ কি কম চেস্টা করেছে ? দুস্ট মুদি কিছুতেই মাসের শেষ বলে এক রত্তি বার্লি বাকি দিল না। বেতন নেই দেড় মাস, দেবে কেন ? তুই কাঁদিসনে মিন্টু। তুই কাঁদলে তোর মাও কেবল কাঁদবে। এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবি, কাল ভোরে সব জ্বর কোথায় চলে গেছে।

নেতা : সকাল পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি ? না, আমি তা পারব না। এতসব আবদার আমার সঙ্গো চলবে না। গেট আউট, ডেভিল্‌স্ ! যাও বলছি।

হাফিজ : উত্তেজিত হবেন না স্যার। কুল্‌লি ! কুউল্‌লি !

মূর্তি : তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। কিচ্ছু ভেবো না, মা। আমি কিছুতেই মরব না। ছায়ামূর্তির মতো বার বার আসব। তুমি যদি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়, দরজায় এসে টোকা দেব। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তোমায় ইশারা করব। তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব মা।

মূর্তি (২) : *(কোলের কল্পিত সন্তানকে)* দূর বোকা। তুই স্বপ্ন দেখছিস। ভয়ের কী আছে ? তুই তো আমার কোলে। আমি থাকতে তোকে মারে এমন দৈত্য দুনিয়ায় নেই। *(সামনের দিকে ইশারা করিয়া)* ওগুলো কিছু না। সব সং সেজে তোকে ভয় দেখাতে চায়। তুই ঘুমো। ঘুমো।

নেতা : ইন্সপেক্টর ! আমি এসব মানি না। আমি স-ব পুঁতে ফেলব। একটা একটা করে গুলি করে আমি সব মাটির সঙ্গো মিশিয়ে দেব। হাজার হাজার হাত মাটির নিচে সব পুঁতে ফেলব। যাতে কোনোদিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলি, সবগুলোকে আবার গুলি কর। গার্ড ! গার্ড !

(হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে মুর্দা ফকির।)

ফকির : জী হুজুর।

নেতা : *(লক্ষ না করিয়া)* গুলি কর।

ফকির : গুলি ! ওহ্ ! হ্যাঁ, আছে। আমার কাছে আরও কয়েকটা আছে। এই নিন বুলেট। খুব তাজা ! টাট্‌কা ! এখনও খুন লেগে রয়েছে। হাত পাতুন। ধরুন। *(স্তম্ভিত ভয়ার্ত বিমূঢ় নেতা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে)* লোড আপনি করুন। আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। যাই। আমি মিছিলটা এই দিকে ডেকে নিয়ে আসি।

(হন্তদন্ত হইয়া ফকিরের প্রস্থান। সেই গমন পথের দিকে তাকাইয়া নেতা একবার নিজের বুক চাপিয়া ধরে। হাফিজ পিছন হইতে আগাইয়া তাহাকে ধরে।)

[নেপথ্যে মুর্দা ফকির চিৎকার করিতেছে : তোরা কোথায় গেলি ? সব ঘুমিয়ে নাকি ? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলি। গুলি হবে। স্ফূর্তি করে উঠে আয় সব। কোথায় গেলি ? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলি? গুলি হবে আজ। কবর খালি করে সব উঠে আয়।]

(মঞ্চের উপরে লাল মূর্তিদ্বয় মুর্দা ফকিরের ডাক কান পাতিয়া শুনিতেছিল। ক্রমে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন–ক্রমে আরও অনেকে–সারি দিয়া চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখাও ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।)

(হাফিজ ও নেতা লক্ষ করে নাই যে মঞ্চ খালি হইয়া গিয়াছে।)

নেতা : *(বিবর্ণ মুখে)* ইন্সপেক্টর ! হার্টটা জানি কেমন করছে ! বড় ভয় পেয়ে গেছি ! একটু ধরে রেখো আমাকে। আর, আর একটু ঢেলে দিতে পারবে ?

হাফিজ : না। আপনার এখনও হুঁশ নেই। আমার নিজেরও হয়ত নেই। ঠিক বুঝতে পারছি না। *(পিছন হইতে গার্ড হঠাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া প্রচন্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে।)*

নেতা : *(চমকাইয়া)* কে ! এটা কী আবার ?

হাফিজ : (দেখিয়া) ইডিয়ট ! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউন্ড নাকি ? বন্দুকের গুলির মতো স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি। কী চাও ?

গার্ড : গাড়িতে উইঠ্যা হগলে আপনাগো লাইগা এন্তেজার করতাছে। সব কাম খতম। কারফিউ শ্যাষ হইতেও আর দেরি নাই।

হাফিজ : *(প্রথম লক্ষ করিল যে, মঞ্চ খালি। ভালো করে কয়েকবার চোখ কচলায়)* গুড্! সব কাজ খতম তো ? গুড্ ! সব কাজ খতম স্যার। নিট জব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার ? ভালো করে দেখুন না নিজেই।

নেতা : *(ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে)* হুম্ !

গার্ড : কিছু তালাশ করতাছেন হুজুর ? খুঁইজা দেখুম ?

নেতা : না, চলো ।

হাফিজ : কিছু না স্যার। এসব কিছু না। গোরস্থানে এরকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার– মানে?

নেতা : হুম্। চলো। আর দেখো, মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক। *(বুকে হাত চাপিয়া ধরে।)*

হাফিজ : এ্যা ? মুর্দা ফকির ? ওহ্ ! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! ইয়েস্ স্যার। *(সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস, বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।)*

অনুশীলনী

কবর

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অংশটুকু পড় এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নাটকে চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে ঘটনা গতি লাভ করে। সংলাপের মাধ্যমেই আমরা অতীত ঘটনা জানতে পারি এবং পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হই। তা ছাড়া সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয় চরিত্রের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা। এ দিক থেকে মুর্দা ফকিরের সংলাপের এ অংশটি তাৎপর্যপূর্ণ ‘‘এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন-এ মুর্দা থাকবে না, কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।’’

১. সংলাপ কী?
   ক. কোনো কিছুর বর্ণনা উপস্থাপন
   খ. পাত্র-পাত্রীর বাক-বিনিময়
   গ. বিশেষ উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করা
   ঘ. নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা

২. সংলাপের অংশটিতে মুর্দা ফকিরের চরিত্রের নিম্নোক্ত পরিচয় পাওয়া যায়–
   i. বিদ্রোহের
   ii. উন্মাদের
   iii. বিপ্লবের

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i
   খ. ii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৩. ‘ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না।’– কে?
   ক. নেতা
   খ. হাফিজ
   গ. প্রথম মূর্তি
   ঘ. মুর্দাফকির

৪. ‘ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না।’ উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
   ক. শহীদদের হত্যার প্রতিবাদ
   খ. শহীদদের অমরত্বের কথা
   গ. শহীদদের প্রতি আবেগের প্রতিফলন
   ঘ. শহীদদের প্রতিবাদের প্রতিফলন

৫. 'মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক।'– কিছুদিন থাকুক' বলতে নেতা কী বুঝিয়েছেন?
 ক. গোরস্থানের বাইরে অবস্থান
 খ. সংশোধনের সুযোগ দেওয়া
 গ. আটকাবস্থায় রেখে দেওয়া
 ঘ. কিছুদিন বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাফিজ : মেহেরবানি স্যার। পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি অফিসারেরাই কেবল কিছু পেলাম না। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে আমাদের এখনও সেই দশা। যদি আপনারা আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কী করে। আমাদের তো কোনো রাজনীতি নেই স্যার। সরকারই মা-বাপ।

 ক. হাফিজ কে?
 খ. 'আমাদের এখনও সেই দশা' – ব্যাখ্যা কর।
 গ. 'সরকারই মা-বাপ!'– এ মন্তব্যের আলোকে চাটুকারদের পরিচয় দাও।
 ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে হাফিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর।

২. পুঁতে ফেল। দশ-পনের-বিশ-পঁচিশ হাত। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে, মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোনোদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, স্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

 ক. উক্তিগুলো কার?
 খ. 'কোনোদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে'– উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর।
 গ. অনুচ্ছেদের নেতিবাচক সংলাপের স্থলে ইতিবাচক সংলাপ প্রতিস্থাপন কর।
 ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ক্ষমা প্রদর্শন মহৎ গুণ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য